প্রাচীন ভারতীয়

বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ

অধ্যাপক শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি-লিট,

লিখিত [illegible]।

শ্রীধ[illegible]চন্দ্র বড়ুয়া

প্রণীত

শ্রীমৎ ভিক্ষু উত্তম

শুভাশীষে প্রকাশিত

মূল্য ১ টাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীমৎ ভিক্ষু উত্তম
মহাবোধি সোসাইটী
[illegible], কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গ্রন্থকারের ঠিকানা—
শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া
সাং ফতেনগর
পোঃ গাছবাড়িয়া, চট্টগ্রাম

মুদ্রাপক—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি-এ,
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ,
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

আমি বিদ্বান নহি। বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনায় আমার যোগ্যতা অল্প। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, পণ্ডিত ও অধিকারী তাঁহারা এত কাল চুপ করিয়া আছেন। এ বিষয়ে যাহা কিছু ভাল আলোচনা সমস্তই ইংরাজী কিংবা অপর বৈদেশিক ভাষায় আছে; মাতৃভাষায় ধারাবাহিক কিছুই নাই। এ ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার মূলে ইহাই আমার চিরদিনের অনুভূত বেদনা। বিশেষজ্ঞের পক্ষে যাহা অল্পদিনে সম্ভব হইত তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আমি বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। যেখানে যাহা সংগ্রহ করিতে পারি সংগ্রহ করিয়াছি, যাঁহার যাঁহার কাছে গেলে উপকৃত হইতে পারি তাঁহার তাঁহার নিকট গিয়াছি। নিজের অর্থকষ্ট ও জীবিকা এবং পরিবারের ভরণপোষণ বিষয়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ করি নাই। তথাপি সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই এবং ইহা সহজসাধ্য মনে করি নাই। কেহ উৎসাহ দিয়াছেন, কেহবা নিরুৎসাহিত করিয়াছেন। মোটের উপর, সকলেই সাহায্য করিয়াছেন। এই পুস্তকের উপাদান সংগ্রহে ও প্রণয়ন কার্য্যে শ্রীযুত সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, এম-বি, শ্রীযুত শৈলেশ্বর চৌধুরী

বি-এল, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ মুৎসুদ্দি, বি-এল, বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সম্পাদক শ্রীযুত শান্ত কুমার চৌধুরী ও বৌদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্র লাল বড়ুয়া, এম-এ, প্রমুখ সহৃদয় ব্যক্তিগণ হইতে আমি যথেষ্ট উৎসাহ ও সহায়তা লাভ করিয়াছি। এ জন্য আমি তাঁহাদের সকলের নিকট চির কৃতজ্ঞ। বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপক শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া ভূমিকা লিখিয়া পুস্তকের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে "বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ" বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইতে পারিয়াছে। পরিশেষে, সমগ্র ব্রহ্ম-দেশের নেতৃস্থানীয় সর্ব্বজন-বিদিত নির্ভীক কর্ম্মী ও সদ্ধর্ম্মের উন্নতি-কামী শ্রীমৎ ভিক্ষু উত্তমের ন্যায় মহাত্মার শুভাশীষসহ এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে পারিয়া আমি ভাগ্যবান।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর-বিহার, কলিকাতা
আষাঢ়ী পূর্ণিমা,
১০শে শ্রাবণ ১৩৪১ সন।

শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া

THE ANCIENT BUDDHIST UNIVERSITIES IN INDIA

Approved and Published by

Rev. OTTAMA BHIKKHU of BURMA

(Born in Akyab)

MAHABODHI SOCIETY
4A, College Square Calcutta
2477
1934

ভূমিকা

বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠের ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করে ইহার গ্রন্থকার ও প্রকাশক আমাকে বিশেষ সম্মানিত করেছেন। আকারে ও আয়তনে সামান্য হলেও বিষয়ের গুরুত্বে ও ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশে "বৌদ্ধ-বিদ্যাপীঠ" বাংলা সাহিত্যে নূতন অবদান ও শ্রেষ্ঠ দান। ভাষার দৈন্যে, লেখকের প্রতিভার অভাবে ইহার মূল্যহানি হবার নহে। ইহা কাব্য নহে, নাটক-নভেল নহে, গল্প কৌতুক নহে। যে জ্ঞান গরিমার বলে ও চরিত্রের মাহাত্ম্যে সুদূর অতীতে মনুসংহিতার চিরস্মরণীয় গ্রন্থকার বিশ্ববাসীকে এদেশে এসে এদেশের অগ্রজন্মা মহাপুরুষ ও আচার্য্যগণের নিকট আপন আপন চরিত্রাদর্শ শিখে যেতে আহ্বান করিতে পেরেছিলেন যে যে উপায়ে সে জ্ঞানগরিমা ও চরিত্র-মাহাত্ম্যের বিকাশ এদেশে হয়েছিল কিংবা হতে পেরেছিল উহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাষ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে। এরূপ পুস্তকের অভাব সব সময়ে, সব জায়গায়, সকলের কাছে। তাই ইহার ভূমিকা লিখিতে আমার এত আনন্দ ও গৌরব- বোধ।

তক্ষশিলা, নালন্দা ও বিক্রমশিলা এই তিনটী বৌদ্ধ-বিদ্যাপীঠ সত্যই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আকার পেয়েছিল।

ওদন্তপুরী, জগদ্দল প্রভৃতি স্থানেও এ রকমের বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠেছিল। বোধগয়া, সাঞ্চী, ভরহুৎ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, সারনাথ, মথুরা, নাসিক, অমরাবতী, নাগার্জ্জুনিকোণ্ড, জগয়্যপেত, কাঞ্চীপুর কাবেরীপট্টন, মাদুরা এবং ভারতের বাহিরে বহুস্থানে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীমান শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়ার পুস্তকে তক্ষশিলা, নালন্দা ও বিক্রমশিলা এই তিন বিদ্যাপীঠেরই বিশদ বিবরণ আছে। যে সব বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার পায়নি, সাধারণভাবে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল উহাদের নমুনাস্বরূপে আছে পাটলিপুত্রের অশোকারাম ও হিমালয় অঞ্চলের সংখেয়্য পরিবেণের বিবরণ। এক একটি প্রদেশে যে ভাবে বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠগুলি বিভিন্ন আকারে ও আয়তনে শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল উহার উদাহরণস্বরূপে আছে সোমপুরী, বিক্রমপুরী, জগদ্দল প্রভৃতি বাংলার পুরাতন বিহারগুলির বিবরণ। এক একটি বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্যেরা যে ভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন উহার দৃষ্টান্তস্বরূপে আছে বৌদ্ধযুগে আয়ুর্ব্বেদের বিবরণ। মোটের উপর, এদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা কি ছিল তা দেখান হয়েছে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে। কত লিখিবার ছিল, কত বলিবার ছিল, পুস্তকের ক্ষুদ্র অবয়বে সব লিখা হয়নি, সমস্ত বলা হয়নি, বলিতে পারা যায়নি। যা লিখা হয়েছে, যা বলা হয়েছে সব বুভুক্ষুর ন্যায় একগ্রাসে নিঃশেষ করে পাঠক বলে

উঠবে—আরও চাই, আরও চাই। একা [illegible] বিহার ও ধর্ম্মরাজিকা তৈরী করেছিলেন ভা[illegible]। এ শুধু কিংবদন্তী নহে, কথার কথা নহে[illegible] সকল? আছে মাটির নীচে, পর্ব্বতে কন্[illegible] নিকেতনরূপে। সে দৃশ্য হৃদয়-বিদারক, অতি শোচনীয়।

এদেশের হিন্দু ঐতিহাসিকগণ সমস্বরে রব তুলেছেন—যত তন্ত্রমন্ত্র, যত মূর্ত্তিপূজা ও প্রতীক উপাসনা, যত অনাচার ও ব্যভিচার সবের জন্য দায়ী বৌদ্ধধর্ম্ম। হিন্দু নিস্তেজ হল, যুদ্ধ ছেড়ে দিল, শৌর্য্যবীর্য্য হারাল শক, কুষাণ, হূণ, তুর্কি, কারো গতিরোধে সমর্থ হল না শুধু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কারণ। ছিল ভাল চাতুর্ব্বণ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি-বিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ; সকল যে ওলটপালট হল ওরও মূলে বেদবিদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্ম।

যত দোষ নন্দ ঘোষ। ঘর যখন ভেঙে পড়ে যা-কিছু ইহার দাঁড়াবার সম্বল সবইত ইহার পতনের সাহায্য করে। হিন্দু ঐতিহাসিক! তুমি ভ্রান্ত। দেবানংপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের হিতকথায় এদেশে দিগ্বিজয় কমেনি, যুদ্ধবিগ্রহ থামেনি, কূটনীতি পরিত্যক্ত হয়নি। অধিকন্তু রাণীদের দানে প্রায় সকল স্থানে গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ মহাচৈত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, দানগৃহ ও বিদ্যাপীঠ, আর রাজারা ছিলেন অগ্নিহোত্রী, অশ্বমেধযাজী, দিগ্বিজয়ী। মন্ত্রী ছিলেন বেদবেদাঙ্গবিশারদ ও কৌটিল্যের কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ। জ্যোতিষী বা

গণকার রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা। গতানুগতিকতা, চতুরঙ্গ সৈন্যের বাহুল্য, বেতনভোগী সৈনিক দ্বারা যুদ্ধ, অন্তর্কলহ, প্রাধান্যে জাতীয়তাবোধের একান্ত অভাব—এ সমস্ত হল এ দেশের স্বাধীনতা হারাবার প্রকৃত কারণ।

ছেলে সাপ মারবার দরকার হলেও তোমার রাজারা ডাকাতেন প্রথম গণকার, পরে বিরাট যজ্ঞ, হোম, পূজা ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা, আর শেষে হত মহিষমর্দ্দিনী, অসুর-ঘাতিনী, দশপ্রহরণধারিনী শক্তির উপাসনা। তুমি কিরূপে আশা করিতে পার নিরস্ত্র নিরীহ নগরের উপকণ্ঠবাসী বিদ্যাপীঠের আচার্য্য ও শিক্ষার্থিগণ বহিশত্রুর সহিত সংগ্রাম করবে। তুমি বিদিত নও যেখানে যেখানে বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল সেখানে সেখানে পাশুপত শৈব ছিল, কেহ কিছু করিতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে নূতন সমাজ গড়েনি, হিন্দুকে আচারভ্রষ্ট করেনি, জাতিচ্যুত করেনি, সমাজশৃঙ্খলা-নষ্ট করেনি, রাজশক্তি পরিচালনা করেনি। তোমার বেদবেদাঙ্গ তোমাতে চিরদিন আছে, তোমার জাতিভেদ তোমাতে আছে, তোমার শ্রুতিস্মৃতি, ইতিহাসপুরাণ, ভৃগু-পরাশর তোমাতে আছে! হিন্দুর ভাবপ্রবণতা, গতানুগতিকতা ও ধর্ম্মান্ধতা দূরীকরণের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়। বৌদ্ধধর্ম্ম কলুষিত হলে এদেশ হতে লুপ্ত হয়ে যেত না। যদি যথার্থই বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হতে বহিষ্কৃত হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে উহার ভিতরে বুজরুকি ছিল না, ছলচাতুরী ছিল না।

ছিল সব রকমের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, প্রচার ও বিস্তার, আর সভ্যতায় এশিয়ার বহু দেশ ও জাতিকে [illegible] কাছে অনুগত করা। বৌদ্ধধর্ম্মের দাঁড়াবা[illegible] সমাজ নহে, রাজশাসন নহে,—সঙ্ঘারাম বা শিক্ষাগার। যে দিন এ সকল সঙ্ঘারাম ইসলাম-পন্থী বিজয়ী তুর্কিবীর একে একে এসে ধূলিসাৎ করিলেন, উহার সব গেল—আর তিষ্ঠিতে পারিল না। বৌদ্ধবিদ্যাপীঠের ইতিহাস একদিকে এই ধ্বংসলীলার করুণ কাহিণী মাত্র!

বৌদ্ধেরা হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য মুসলমান আক্রমণকারীকে এদেশে ডেকে এনে নিজের নাক কাটালেন ও পরের যাত্রাভঙ্গ করিলেন ইহা একেবারে ভুয়ো কথা। সাধুর বেশে তোমার রাজাদের অবিশ্বাসী গুপ্তচরগণ সর্ব্বত্র চলাফেরা করিতেন—ইহা নূতন কথা নহে। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের শেষে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" শীর্ষক যে কবিতাটি আছে তাহাই হল তোমার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি। 'দেব নিরঞ্জন' যে বুদ্ধ আর "শূন্যপুরাণ" যে বৌদ্ধগ্রন্থ তাহাই তুমি প্রমাণ করিলে না, সাক্ষীপ্রমাণ ছাড়াই তুমি স্বকল্পিত আসামীকে ফাঁসি দিয়া বসিলে। এদেশে তথা এদেশের উপনিবেশসমূহে বহু লেখমালা বচ্ছরের পর বচ্ছর আবিষ্কৃত ও পঠিত হচ্ছে। তুমি স্থিরচিত্তে এসকল পড়, চিন্তা কর আর বল তোমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত! এদেশের জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের ধারা কি? ব্রহ্মা ও মহেশ্বর এক (প্রপিতা-

মহেশ্বর), হরি ও হর এক, বুদ্ধ ও শিব এক, যে-ই বুদ্ধ সে-ই শিব (সৌগত-মহেশ্বর)। আর সব কথা সত্য হলেও একথা সত্য নহে—বৌদ্ধধর্ম্ম তোমার জাতীয়তা নষ্টের কারণ! এ সকল কল্পনা ছেড়ে তুমি নীরবে চিন্তা কর গৃহত্যাগী ও ভিক্ষান্নে দিনযাপনকারী বৌদ্ধাচার্য্যগণ কিরূপে এদেশে সর্ব্বত্র জ্ঞান, বিজ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্য সঙ্ঘারাম, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। শ্রীমান শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়ার পুস্তকে লুপ্ত বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠসমূহের উজ্জ্বল স্মৃতি জাগিয়ে তোলে বলেই তাহা আমার কাছে এত প্রিয় বস্তু, আদরের সামগ্রী।

শিক্ষার প্রণালী, উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিষয়ে বহু তথ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। কোন্ প্রকারের শিক্ষা কোন্ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী, শিক্ষা ক্রমিক হবে কিংবা হবে না, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা কিরূপ হবে, মনের শিক্ষা ও গঠন কিরূপ হবে, চরিত্রের শিক্ষা ও গঠন কিরূপ হবে, বুদ্ধির শিক্ষা ও গঠন কিরূপ হবে, শিক্ষা কোন্ প্রকার জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হবে, কোন্ জাতীয় শিক্ষকের হস্তে শিক্ষার ভার ন্যস্ত হবে, পাঠক্রম কিরূপ হবে, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন কিরূপ হবে, ইত্যাদি বিষয় সম্যক্ আলোচিত হয়েছে।

জ্ঞান ও চরিত্রের পথে এগোবার বড় রাস্তা হল আর্য্য-অষ্ট-মার্গ। সকলের আগে চাই সম্যক্ দৃষ্টি। যাহা সম্যক্ তাহা ঋজু, সরল, অভ্রান্ত, লক্ষ্যভেদী। তারপর সম্যক্ সঙ্কল্প

যাহা লক্ষ্যাভিমুখী, সুদৃঢ়, অটল, অচল, স্থির। এরূপ [illegible] ও সঙ্কল্প লইয়াই জ্ঞানানুগা শ্রদ্ধার পূর্ণতা। সম্যক্ [illegible] প্রকাশ সম্যক্ বাক্য, আজীব ও কর্ম্মে [illegible], বাক্য [illegible] কর্ম্মের সমতা সাধনে জীবনের গতি নি[illegible] হয়, জীবন মর্য্যাদাসম্পন্ন ও উন্নতিশীল হয়। প্রকৃত আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে সম্যক্ ব্যায়ামের প্রয়োজন। ব্যায়ামের অপর নাম প্রধান বা পরাক্রম স্বসাধ্য বস্তুর পূর্ণ সাধনের জন্য। শুধু উপস্থিত ব্যাধি নিবারণ করিলে চলবে না, ভাবী ব্যাধির পথ রুদ্ধ করিয়াও কর্ত্তব্য শেষ হল না, বর্ত্তমান স্বাস্থ্য রক্ষা করেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না, আশানুরূপ স্বাস্থ্যবৃদ্ধির উপায়ও সঙ্গে সঙ্গে করে যেতে হবে। এরূপে দেহের, মনের ও চিত্তের স্বাস্থ্যবর্দ্ধনের জন্যই ব্যায়াম। আহার শুধু দেহের পুষ্টির জন্য নহে, ইন্দ্রিয়, মন ও বিজ্ঞান সকলের পরিপুষ্টির জন্য উপযুক্ত ও পর্য্যাপ্ত আহারের প্রয়োজন। পরিপুষ্টি সাধনের পক্ষে ব্যায়াম যথেষ্ট নহে; প্রয়োজন আছে সম্যক্ স্মৃতির। স্মৃতির অনুশীলনের পক্ষে প্রয়োজন সতত, সব সময়ে, সকল অবস্থায় জাগ্রত, সচেতন ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে চলা। সে জন্য চাই একাগ্রতা, মনঃসংযোগ, দেহের ও মনের লঘুতা, মৃদুতা, কমণীয়তা প্রভৃতি গুণ। লক্ষিত বিষয় পেতে হলে চাই শেষে সম্যক্ সমাধি, তন্ময়তা। সমাধির পর সমাধি, সোপানের পর সোপান। পদে পদে অগ্রসর হয়েছ, আত্মপ্রসাদ পেয়েছ, তথাপি আছে "উত্তরিতর", আজও

মায়ার [illegible] [illegible]গ্যাবার। তবে তুমি উন্নতির পথের যথার্থ [illegible]

[illegible] করিতে চাওত ছাড় শ্রুতিপরম্পরা, ছাড় অন্ধতা ও শাস্ত্রনির্ভরতা, ছাড় কূটতর্ক ও বাগ্বিতণ্ডা, ছাড় মতামতের দোহাই। আপন বিবেক, চিন্তা ও যুক্তির সহিত যাহা মিলেনা তাহা মেনে নিও না, পরের মুখে ঝাল খেও না, বাহিরের রূপে, সভ্যবভ্যতায় মানুষের বিচার করোনা।

"মা অনুস্সংবন, মা পরম্পরায়, মা ইতিকিরিয়ায়, মা পিটকসম্পদানেন (সম্পদায়েন), মা তক্কহেতু, মা নয়হেতু, মা আকারপরিবিতক্কেন, মা দিট্‌ঠিনিজ্ঝানখন্তিয়া, মা ভব্বরূপতায়, মা সমণো নো গরু"তি।

শুধু পরমত জেনে, পরের বই পড়ে, শাস্ত্রপাঠ করে, গুরুমশায়ের মুখে মুখে শুনে, কিংবা পাঁচজন হতে খবর নিয়ে যে জানা তাহা হল মাত্র জ্ঞাত-পরিজ্ঞা (জ্ঞাত পরিজ্ঞান)। ইহা জ্ঞানের চরম নয়, সূত্রপাত। দ্বিতীয় স্তরে আসা চাই তীরণ-পরিঞ্‌ঞা, জ্ঞাত-জ্ঞানের সীমা অতিক্রমের চেষ্টা ও ক্ষমতা। তৃতীয় স্তরে চাই পহাণ-পরিঞ্‌ঞা (বর্জ্জন-পরিজ্ঞান), স্বজ্ঞানের দ্বারা প্রচলিত ভ্রান্তমত সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন। ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে গেলে, তখন মনে হবে—"অয়ং পন্নকো জিনো ন কিঞ্চি আহ", "এই জীর্ণকায় গুরুমশায় বলবার মত কিছুই বলেনি, বলিতে পারে নি।"

অপর হতে লব্ধ জ্ঞান হল শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা। [illegible] প্রসূত জ্ঞান চিন্তাময়ী প্রজ্ঞা। আর স্থাপনা[illegible] প্রসূত জ্ঞান ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা। যদি প্রথম প্রকারের জ্ঞান তোমার লক্ষ্য তাহা পাবার পন্থা হল এই। যদি দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান তোমার লক্ষ্য, তাহা পাবার পন্থা হল এই। আর যদি তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান তোমার লক্ষ্য, তাহা পাবার পন্থা হল এই। তোমায় যেতে হবে তিন রাস্তায়। এক এক জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সাধন।

শিক্ষার্থী সব সমান নয়। কেহবা উগ্‌ঘাটিতঞ্‌ঞু (উদ্ঘাটিতজ্ঞ), হা-তে হাওড়া বুঝে নিতে পারে, আভাষে সব বোঝে, সঙ্কেত মাত্র যথেষ্ট। কেহ বা বিপঞ্চিতঞ্‌ঞু (বিপশ্চিতজ্ঞ), সামান্য ব্যাখ্যা পেলেই বুঝে নিতে পারে, অর্থের উপলব্ধি হয়। কেহ বা নেয়্য (নেয়), পদে পদে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অর্থবোধ করাতে হয়, এত ধামা-চাপা বুদ্ধি, এত চিন্তার স্বল্পতা ও জড়তা। কেহ বা শুধু পদ-পরম, মুখস্থবিদ্যা সার, অর্থবোধ একেবারে নাই, কোরণসরিপ্‌ আবৃত্তি করে হাফিজ, মানে জিজ্ঞাসিলে হতভম্ব। প্রথম্‌ শিক্ষার্থীর পক্ষে উপদেশের স্বরূপ এক, ব্যাখ্যা প্রণালী এক, অপরদের পক্ষে অন্যরূপ।

যে আচার্য্য বা শিক্ষকের উপর শিক্ষার ভার তাঁকে পঁচিশটি গুণের অধিকারী হতে হবে; তিনি সদাসর্ব্বদা ও সাবধানে অন্তেবাসীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন;

অন্তেবাসীর অভ্যাস অনভ্যাস জানবেন, প্রমত্ততা অপ্রমত্ততা জানবেন, শয়ন ও বিশ্রাম অবগত হবেন, সুখাসুখ জানবেন, খেতে পেলে না পেলে জানবেন, রুচি বিশেষ বিদিত হবেন, ভুজ্যদ্রব্য উপযুক্তভাবে ভাগবণ্টন করে দেবেন, উৎসাহ দেবেন—মা ভৈঃ, তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, ভিতরে চলে কিরূপে জানবেন, বাহিরে চলাফেরা করে কিরূপে তাও জানবেন, কুলোকের সহিত অলাপাদি করবে না বলে দেবেন, দোষ দেখলে শোধরাবেন, সাগ্রহে, অখণ্ডভাবে, নিষ্কপটে ও নিরবশেষে কর্ত্তব্যপরায়ণ হবেন, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী করিব এরূপ পিতৃহৃদয় পোষণ করবেন, শিক্ষাবলে বলীয়ান করিব সঙ্কল্প রাখবেন, মৈত্রীচিত্ত জাগরূক রাখবেন, বিপদ আপদে অন্তেবাসীকে পরিহার করবেন না, ইত্যাদি।

আচার্য্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য দায়ী, উপাধ্যায় চরিত্রগঠনের জন্য দায়ী। যেমন শিক্ষক ভাল তেমন ছাত্র ভাল হওয়া চাই। বিশ্বপ্রকৃতির সকল বস্তু, সকল জীব ও সর্ব্বঘটনা হতে জ্ঞানাহরণের ক্ষমতা থাকা চাই। সমচর্য্যা, সমদর্শিতাদি গুণে গুণী হওয়া চাই। বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার। বিচারে নিরপেক্ষতা, নির্ভীকতা, দ্বেষশূন্যতা ও অমূঢ়তা থাকা আবশ্যক। যেমন একদিকে পরীক্ষা, উপপরীক্ষা, তুলনা, গবেষণাদি গুণ তেমণ অপরদিকে উপযুক্তভাবে প্রকাশের শক্তি থাকা আবশ্যক। জ্ঞান, কর্ম্ম ও চরিত্র এরূপে নিয়মিত

হওয়া আবশ্যক যাহাতে ব্যক্তির জীবন বিকশিত হয়। ইন্দ্রিয় দমন অর্থে ইন্দ্রিয় নিধন করা নহে। জাতিভেদ দূরীকরণ অর্থে 'জাতিবাদ' বা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করা নহে। সংস্কার অর্থে বিলোপ সাধন করা নহে। যে কোন আকারে জীবনের অভিব্যক্তি হয় উহাকে অর্থযুক্ত করে তোলাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

এ প্রকারের বহু আলোচনা বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। সমস্তই পাকা কথা, খাটি কথা! এ সকল বিষয় ক'জনাই বা এদেশে এখনও জানে, কে-বা খোঁজ রাখে। মৌমাছি হওয়া হল উপদেশ, আমরা সেজেছি ভাল দোষান্বেষী মক্ষিকা। যে সেকল মৌচাকে মধু আহৃত হয়েছিল উহাদের কিছু কিছু সংবাদ মৌমাছির ন্যায় এফুল ওফুল হতে সংগ্রহ করে শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ রচনা করেছেন অতি কষ্টে, অতি যত্নে, বিপুল আগ্রহে! তাঁহার শ্রম জয়যুক্ত হউক।

সর্ব্বজনবিদিত সদ্ধর্ব্বপ্রাণ ভিক্ষু শ্রীমৎ উত্তম কুটিল কুপথে না এগিয়ে সুপথে চলেছেন দেখে আমার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। রাজনীতি কুটিল কুপথ, ইহা বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাজ নয়। যার যে কাজ তাই করা ভাল। এখনও ব্রহ্মদেশে বিহারগুলি যে অবস্থায় আছে চেষ্টা করিলে কম পক্ষে চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে। মান্দালে যাও দেখিবে এক একটি বিহার এক একটি সুবৃহৎ কলেজ। এক একটি বিহারে ছাত্র-

সংখ্যা পাঁচ শ', সাত শ', এমন কি হাজারেরও ওপর। এদের খোরাক পোষাক কে যোগায়? সরকার নহে, বৌদ্ধ দায়কদের মুক্তহস্তে দেওয়া সম্মিলিত দান। বাহিরে দেখ, মাইল কে মাইল ব্যাপিয়া আছে সাজান মার্ব্বেল পাথরগুলি স্তুপিঠে অমূল্য পালি ত্রিপিটিক ও অর্থকথা ধারণ করে। যে-ই ইচ্ছা পড়ে'যাও, সবাকার জন্য দ্বার খোলা, সব সময়ে। এ প্রকার মুক্ত পাঠাগার জগতে আর কোথায় আছে!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
২১। ।৩৪

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া

বিষয়-সূচী

বৌদ্ধ আদর্শ শিক্ষাগার

“অঞ্ঞে ধম্মানি দেসেন্তি, অঞ্ঞে কীলন্তি ইদ্ধিয়া।
অঞ্ঞে অভিঞ্ঞা অপ্পেন্তি, অভিঞ্ঞাবসিভাবিতা॥
বুদ্ধাপি বুদ্ধে পুচ্ছন্তি বিসয়ং সব্বঞ্ঞুমালয়ং।
গম্ভীরং নিপুণং ঠানং পঞ্ঞায় বিনিবুজ্ঝরে।
সাবকা বুদ্ধে পুচ্ছন্তি, বুদ্ধা পুচ্ছন্তি সাবকে।
অঞ্ঞমঞ্ঞঞ্চ পুচ্ছন্তি, অঞ্ঞমঞ্ঞং ব্যাকরোন্তি তে

[অপদান]
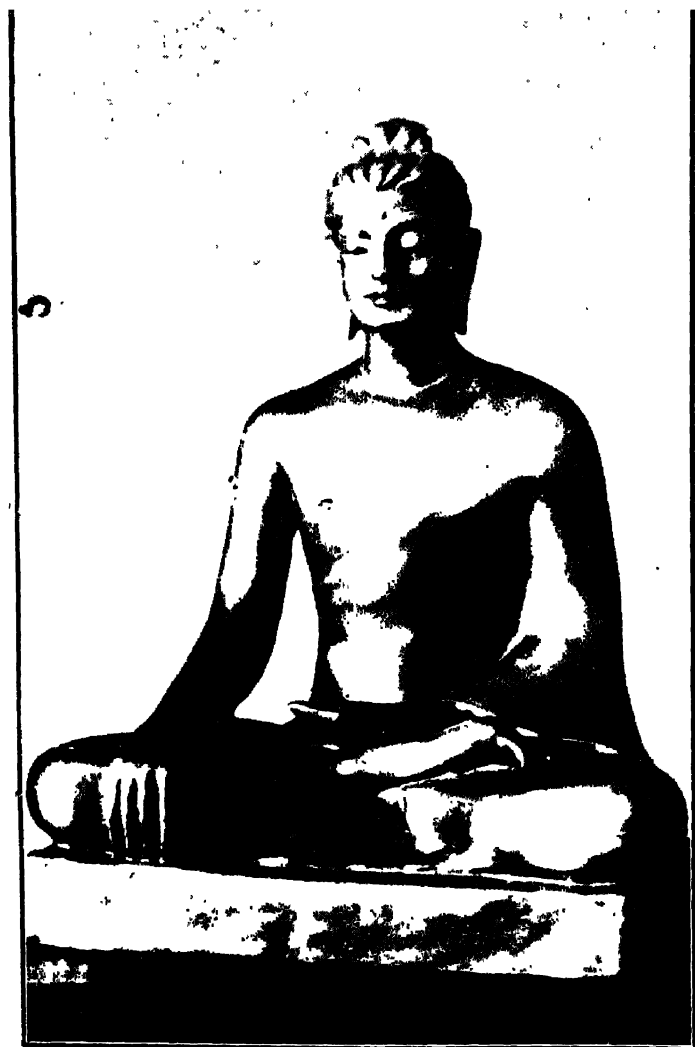
ভগবান বুদ্ধ

নালন্দায় প্রথম খননকার্য্যকালে প্রাপ্ত মূর্ত্তি)

১। তক্ষশিলা

তক্ষশিলা ভারতবর্ষের এক অতি পুরাতন ও প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এক সময় ইহার জ্ঞান-সৌরভে জগৎ মুগ্ধ ছিল। তখন মিশর, ব্যাবিলন, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের শিক্ষার্থিগণ এই শিক্ষামন্দিরে আগমন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব বিনিময় করিতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার বিষয় ছিল—ত্রিবেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যা। অষ্টাদশ বিদ্যা বলিতে—বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়। ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ, একত্র 'ত্রয়ী ত্রিবেদ' নামে অভিহিত হইত।

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিলে তখন কাহারও উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত হইত না। সুতরাং গ্রীকেরা আয়ুর্ব্বেদ

শিক্ষা করিবার জন্য তক্ষশিলায় আগমন করিতেন। বারাণসী, মিথিলা, ইন্দ্রপ্রস্থ, মগধ, কোশল, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভারতের নানা দেশীয় রাজপুত্রগণ এবং পুরোহিত, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রগণ শিল্পবিদ্যা ও বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য তথায় গমন করিতেন। ক্ষত্রিয়কুমারগণও বেদ শিক্ষা করিতেন। শিষ্যেরা গুরু গৃহে বাস করিতেন। যাঁহারা দরিদ্র তাঁহারা কেবল সেবাযত্ন করিয়া গুরুকে সন্তুষ্ট করিতেন।

মগধের রাজবৈদ্য জীবক-কৌমারভৃত্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিয়াছিলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য অধ্যবসায় বলে চতুর্দ্দশ বৎসরের শিক্ষণীয় বিষয় সাত বৎসরেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসারের রাজত্ব সময়ে এবং ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধের জীবিত কালে জীবক রাজ-চিকিৎসক ও ভগবান্ বুদ্ধের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের চিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে পাণিনি অন্যতম। চাণক্য পণ্ডিত পুষ্পপুরে আগমনের পূর্ব্বে তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তক্ষশিলায় চৈনিক পরিব্রাজকগণঃ—

চারিশত শতাব্দীতে ফা-হিয়ান তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন

তিনি উক্ত নগরের নাম 'চু-সা-শিলো' বা 'খণ্ডিত মস্তক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত 'চতুঃশির' হইতেই 'চু-সা-শিলো'র উৎপত্তি।

পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাং স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে সপ্তম শতাব্দীতে এই নগরীতে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-পর্য্যটন-কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময় বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহারাদি দ্বারা এই নগর পরিশোভিত ছিল; কিন্তু সংস্কারাভাবে তৎসমস্ত ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তক্ষশিলার ভৌগোলিক নির্দ্দেশঃ—প্লিনির মতানুসারে প্রাচীন পুষ্পলাবতী বা হস্তনগর হইতে ৫৫ মাইল পূর্ব্বদিকে তক্ষশিলা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ক্যানিংহাম-প্রমুখ তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া একেবারেই মনে করেন না।

ফা-হিয়ান্, সুংয়ুন্, হিউয়েন্ সাং প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ একমতে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে তিন দিবসের পথ অগ্রসর হইলে তক্ষশিলা নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। যদি ইহা ঠিক হয়, কালকাসাইয়ের অনতিদূরে সাদেরীর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তক্ষশিলার প্রকৃত স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মতের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া থাকেন। আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি গ্রীক লেখকগণ তক্ষশিলার গৌরব ও সমৃদ্ধির বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল

বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাদেরীর ভগ্নাবশেষই প্রাচীন তক্ষশিলার স্থান। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন যে, পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাওলপিণ্ডি প্রদেশই তক্ষশিলার স্থান।

তক্ষশিলার নামকরণ ঃ—পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, তক-জাতি কর্ত্তৃক তক্ষশিলা স্থাপিত হইয়াছিল। তক-জাতীয় পুরুষের নাম 'তক্ষক' ছিল। তাঁহারা নাগ-পূজক ছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ইহাকে 'টেকজিলা' নামে বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, পালি 'তক্ক' (সংস্কৃত 'তর্ক') শব্দ হইতে তক্ষশিলা নামের উৎপত্তি। তাঁহাদের মতে, এই স্থানে সেই সময় বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়া তর্ক-শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন বলিয়া এই নামেই ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মহাভারতে তক্ষশিলা ঃ—মহাভারতের আদিপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা জন্মেজয় তক্ষশিলা জয় করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহাও কথিত আছে যে, তক্ষশিলা নগরে সর্পের পূজা প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করার পর হইতেই সর্প পূজার প্রথা রহিত করেন।

ঐতিহাসিক বিবরণ ঃ—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কিছুকাল পরে গ্রীক সেনাপতি সেলিউকস্ তক্ষশিলা

প্রদেশ অধিকার করেন। তৎকালে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। গ্রাক সেনাপতি সেলিউকসের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুতা হয়। সেই বন্ধুতাসূত্রে সেলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তের নিকট হইতে কতকগুলি হস্তী উপহার পান, এবং উহার বিনিময়ে তিনি তাঁহাকে তক্ষশিলা প্রদেশ প্রদান করেন। মগধ সাম্রাজ্যের বহিরঞ্চল চারি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। যথা :—তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তোসলি ও সুবর্ণগিরি। তক্ষশিলা গান্ধার-রাজ্যের রাজধানী ছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পঞ্চাশ বৎসর পরে রাজা বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা সুসীম তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজা বিন্দুসারের মধ্যম পুত্র অশোক তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমনপূর্ব্বক শান্তি স্থাপন করেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র কুণাল ঐ প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৌর্য্যবংশীয় রাজন্যগণের রাজত্বকালে উক্ত প্রদেশ একজন শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। তিনি পাঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশ পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। উজ্জয়িনী নগর অবন্তী রাজ্যের রাজধানী ছিল। মৌর্য্য সম্রাট্গণ এই স্থান হইতে পশ্চিম ভারত পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। সুবর্ণগিরির অবস্থান এখনও সঠিক জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যেই উহা অবস্থিত ছিল। মৌর্য্য বংশের অধঃপতনের পর তক্ষশিলা বক্ত্রিয়া বা বাহ্লীক দেশের রাজা ইউক্রেটাইউসের হস্তগত হয়। ১২৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকদিগের নিকট হইতে শক জাতীয়গণ উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন এবং পরিশেষে কুষাণ বংশীয় শকগণ

তক্ষশিলা হস্তগত করেন। তৎকালে সম্রাট্ কণিষ্ক উক্ত সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ২৭২ অব্দে মৌর্য্য সম্রাট্ অশোক মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কলিঙ্গ প্রদেশ তোসলি হইতে শাসিত হইত। এই বৃত্তান্তের সহিত গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বৃত্তান্তের ঐক্য দেখা যায়। দীপবংস, মহাবংস ও অন্যান্য পালি গ্রন্থের বিবরণ মতে অশোক মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করিবার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ চতুর্থ বৎসরে তাঁহার অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ২৯৬—২৭২ অব্দে সম্রাট্ অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোকের পিতামহ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৩২১ হইতে ২৯৭ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজগৃহ (বর্ত্তমান রাজগিরি, প্রাচীন নাম গিরিব্রজ বা কুশাগরপুর) মগধের প্রাচীন রাজধানী। মগধাধিপতি বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। রাজগৃহের চতু-স্পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চ পর্ব্বতের নাম বিপুলগিরি, বৈহারগিরি, পাণ্ডবগিরি, গৃধ্রকূট ও ঋষিগিরি। বর্ত্তমান রাজগৃহের আড়াই মাইল ব্যবধানে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গৃধ্রকূট পর্ব্বত। উহা মৌনগিরি নামে সুপরিচিত। রাজগৃহে ভগবান্ তথাগত সম্যক্-সম্বুদ্ধ দ্বিতীয় বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক এক সময় সম্যক্-সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাবস্তী নগরীতে আহ্বান করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তী কোশল অধিপতি রাজা প্রসেনজিতের রাজধানী। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক বহু অর্থব্যয়ে শ্রাবস্তীর সন্নিকটে জেতবন বিহারের ভূমি ক্রয় করেন এবং তথায় বিহার নির্ম্মাণপূর্ব্বক সম্যক্-সম্বুদ্ধকে দান করেন। তিনি বহু স্বর্ণ-মুদ্রাও দান করিয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব শিষ্যগণসহ জেতবন বিহারে অনেকবার বর্ষাবাস করিয়া তাঁহার অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাং যখন ভারত পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি উক্ত স্থানের ভগ্নাবশেষ দর্শন করেন।

•

ফা-হিয়ান বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাজা প্রসেনজিৎ সম্যক্-সম্বুদ্ধের চন্দনকাষ্ঠের এক প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সারিপুত্র ও মহামৌদ্গলায়ন সেই সময়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া জেতবন বিহারে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধঘোষ মগধ সাম্রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে তিনি দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। কথিত আছে যে, তিনি সিংহল হইতে পুনঃ প্রত্যাগমন করিয়া ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য শ্যামরাজ্যে গমন করেন। শ্যামরাজ্য হইতে সুমাত্রা পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই সকল প্রদেশে

ও ভারতের অন্যান্য স্থানে তখন হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হয়। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে মহাযান ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

তৃতীয় সঙ্গীতিঃ—মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের রাজত্ব কালে মগধের রাজধানীতে বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য মহা-ভিক্ষুসমাগম হয়। সঙ্ঘরাজ তিষ্য উক্ত সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতিকে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অশোক প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান্ তথাগত সম্যক্-সম্বুদ্ধের প্রদর্শিত ধর্ম্ম কি? এবং তাঁহার উপদেশের সংখ্যা কত? ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে এই ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে?" সভাপতি তিষ্য উত্তর করিলেন—"ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধের উপদেশের সংখ্যা অশেষ; কিন্তু মানবের মঙ্গলার্থ চুরাশি হাজার সদুপদেশ জগতে প্রদর্শিত হইয়াছে।" মহা-ভিক্ষুসমাগমের সভাপতির অভিভাষণ এবং তাঁহার অমিয় ধর্ম্মোপদেশ ব্যাখ্যা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া অশোকের মানসপটে ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধের চিত্র সমুদিত হইল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল—নূতন চিন্তা ও ভাবধারা অন্তরে প্রবাহিত হইল। কথিত আছে, ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধের চুরাশি হাজার ধর্ম্মোপদেশ-বাণীর বিষয় চিন্তা করিয়া মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোক মানবের মঙ্গলার্থ তাঁহার সাম্রাজ্যে চুরাশি সহস্র বৌদ্ধ চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন।

অশোকের চৈত্য নির্ম্মাণের সংকল্প শ্রবণ করিয়া, সমাগত ভিক্ষুসঙ্ঘ আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পর মগধ-সম্রাট্ অজাতশত্রু বুদ্ধের শরীর-ধাতু রাজগৃহে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ, আপনার নির্ম্মিত আশোকারামে বুদ্ধের ধাতু প্রতিষ্ঠা করিলে মানবের অশেষ কল্যাণ হইবে।" তচ্ছ্রবণে মহারাজ ধাতু সংগ্রহের জন্য রাজগৃহে দূত প্রেরণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে নিজ রাজ্যে চুরাশি হাজার ধর্ম্মরাজিকা নির্ম্মাণার্থ শিল্পীদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু কেহই রাজগৃহের চতুষ্পার্শ্বে বুদ্ধের ধাতুর কোন সন্ধান পাইলেন না। সম্রাটের আদেশে চুরাশি হাজার চৈত্যের কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা হইল। সম্যক্-সম্বুদ্ধের শরীর-ধাতুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, মহারাজ দূত প্রমুখাৎ এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন। সম্রাট্ তখন পাটলিপুত্রে এক হস্তী-পৃষ্ঠে সহস্র স্বুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি থলি রাখিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে যে কেহ মহারাজ অজাতশত্রু-কর্ত্তৃক ভূগর্ভে নিহিত সম্যক্-সম্বুদ্ধের শরীর-ধাতু উদ্ধার করিতে পারিবেন, কিংবা ধাতুস্তূপের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তিনি এই রাজ-পুরস্কার লাভ করিবেন। রাজ-পুরস্কারের ঘোষণা পাটলিপুত্র নগরে প্রচারিত হইল। সপ্তাহের মধ্যে জনৈকা বৃদ্ধা উপাসিকা ভূগর্ভে প্রোথিত ধাতুর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। তথাগত সম্যক্-সম্বুদ্ধের শরীর-ধাতু প্রাপ্ত হইয়া মগধ-সাম্রাজ্যে আনন্দের কোলাহল-ধ্বনি উত্থিত হইল। সম্যক্-সম্বুদ্ধের শরীর-ধাতু প্রত্যেক চৈত্যে সমান ভাবে স্থাপন করিলেন।

স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন এবং চুরাশি হাজার ধাতুচৈত্য নির্ম্মিত হইল, মগধ-সাম্রাজ্য এক সপ্তাহ কাল দীপমালায় সজ্জিত হইল। কথিত আছে, চুরাশি হাজার চৈত্য নির্ম্মাণ এবং ধাতু স্থাপন কালে মার কর্ত্তৃক অশোক অনেক বার লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন উপগুপ্ত মারকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র ও পরাজিত করেন।

জাতকের বিবরণঃ— জাতক পাঠে জানা যায় যে, বারাণসী হইতে দুই হাজার যোজন ব্যবধানে তক্ষশিলা মহানগর অবস্থিত ছিল। বারাণসীর সুসীম রাজার পুরোহিতের পুত্র এক দিবস বারাণসী হইতে তক্ষশিলায় উপস্থিত হইয়া কোন শিক্ষাচার্য্যের নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং অরুণোদয় হইতে না হইতেই বেদত্রয় ও গজশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া বারাণসীতে প্রত্যাগমন করেন। ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব্বজন্মে বোধিসত্ত্বরূপে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তক্ষশিলা শিক্ষা-মন্দিরে গমন করেন। বোধিসত্ত্ব বেদত্রয় ও অষ্টাদশ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তক্ষশিলা শিক্ষা-মন্দির হইতে 'চুল্ল-ধনুগ্‌হ' পণ্ডিত উপাধিতে বিভূষিত হন। গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে বোধিসত্ত্ব এক সময় বিখ্যাত শিক্ষাচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তক্ষশিলায় সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব নিজ ধনসম্পত্তির মমতা ত্যাগ

করিয়া প্রব্রজ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে বাস করিতেন। তথায় পঞ্চাশ জন তাপস তাঁহার নিকট গমন করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। নালন্দা

ভৌগোলিক নির্দ্দেশঃ—নালন্দা প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ। ক্যানিংহাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহা বিহার প্রদেশে রাজগির (রাজগৃহ) হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী একটী গ্রাম। ঐ গ্রামের বর্ত্তমান নাম বরগাঁও।

যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী ভারত-গগনে উড্ডীয়মান হইতেছিল, তখন বিশ্ব-বিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় মগধের দ্বিতীয় শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল। তৎকালে সুদূর চীন, জাপান, তাতার, তিব্বত, শ্যাম, আনাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশসমূহ হইতে ছাত্রগণ তথায় আসিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। দিবারাত্র তথায় নানা বিদ্যার চর্চ্চা হইত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাংয়ের চরিতকার লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদি ও পরবর্ত্তী কালের আঠার প্রকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি ভিন্ন এই স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রেরও চর্চ্চা হইত।

বৌদ্ধ সাহিত্যে নালন্দাঃ—প্রাচীন পালি বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানা যায়, ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধ প্রায়ই নালন্দায় গমন করিতেন। একদা ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুগণসমভিব্যাহারে রাজগৃহ হইতে নালন্দায় গমন করেন। সেই সময় সুপ্রিয় নামক জনৈক পরিব্রাজকও তাঁহার শিষ্যসহ বুদ্ধের অনুগমন করিয়াছিলেন। পথ চলিতে চলিতে সেই পরিব্রাজক ভগবান্ বুদ্ধের নিন্দা এবং তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মদত্ত তাঁহার প্রশংসা করিতেছিলেন।

যখন ভগবান্ বুদ্ধ অম্বলট্‌ঠিকার উরাজোদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভিক্ষুগণ পরিব্রাজক সুপ্রিয়ের মুখে বুদ্ধের নিন্দা এবং তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মদত্তের মুখে তাঁহার প্রশংসার বিষয় আলোচনা করেন। ভিক্ষুদের আলোচ্য বিষয় অবগত হইয়া সেই স্থানে ভগবান্ বুদ্ধ ব্রহ্মজাল-সূত্র ব্যাখ্যা করেন।

ভগবান্ বুদ্ধ অন্য এক সময়ে নালন্দায় পাবারিকা-আম্রবনে বাস করিতেছিলেন। জনৈক সম্ভ্রান্ত গৃহপতি-পুত্র তাঁহার নিকট আগমন করিয়া নালন্দা উন্নতিশীল ও প্রশস্ত এবং লোকদ্বারা ঘনসন্নিবিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন। গৃহপতি তাঁহাকে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি স্থানীয় লোকসকলের বিশ্বাস ছিল। ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর কাহাকেও ঋদ্ধি-বলের দ্বারা কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইতে আদেশ করিলে নালন্দার জন-সাধারণ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিল।

মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র পাঠে জানা যায়, ভগবান্ বুদ্ধ যখন নালন্দায় বাস করিতেছিলেন, তখন শারিপুত্র তাঁহার দর্শন লাভের আশায় তথায় উপস্থিত হন। ভগবান্ বুদ্ধ পাবারিকা-আম্রবনে অবস্থান কালে ভিক্ষুসংঘের সহিত অনেক সারগর্ভ ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা করেন।

যখন ভগবান্ বুদ্ধ নালন্দায় বাস করিতেছিলেন, তখন জনৈক গৃহপতি তাঁহার নিকট আগমন করিয়া অর্হতের পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে ভগবান্ বুদ্ধ নির্ব্বাণ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন।

অন্য এক সময়ে ভগবান্ বুদ্ধের নালন্দায় পাবারিকা-আম্রবনে অবস্থান কালে, আসিবন্ধনপুত্র নামক জনৈক ব্যক্তি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন, "ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের মন্ত্রবলে মৃত ব্যক্তিদিগকে স্বর্গে পাঠাইতে পারেন বলিয়া প্রচার করেন; আপনি মৃত ব্যক্তিদিগকে স্বর্গে পাঠাইতে পারেন কি?" ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধ তদুত্তরে বলেন, "যাহারা জীব-হত্যা, চুরি ইত্যাদি অপকর্ম্ম করে তাহারা স্বর্গে যাইতে পারে না।"

পুনরায় তিনি ভগবান্ বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন—"আপনি কেন সকলকে সমান ভাবে ধর্ম্মোপদেশ করেন না? ভগবান্ বুদ্ধ তদুত্তরে বলেন, "ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অনুসারেই বীজ বপন করা উচিত।"

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রাজগৃহ হইতে নালন্দা পর্য্যন্ত একটা রাজপথ ছিল। একদা ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধ

ঐ রাস্তা দিয়া গমনকালে রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে পথিপার্শ্বে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় কশ্যপ নামে একজন ভিন্নমতাবলম্বী আচার্য্যের শিষ্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। এই কশ্যপই পরে মহাকাশ্যপ নামে খ্যাতি লাভ করেন। মজ্‌ঝিম-নিকায় পাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে নিগ্রহনাথপুত্র বহুসংখ্যক শিষ্য-সমভিব্যাহারে নালন্দায় বাস করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধও নালন্দায় পাবারিকা-আম্রবনে বাস করিতেছিলেন। অতঃপর দীর্ঘতপস্বী নামে একজন জৈন পাপ কর্ম্ম বিনাশের হেতু জিজ্ঞাসা করিয়া উপালীর নিকট বুদ্ধের নির্দ্দেশিত শিক্ষাপদগুলি শ্রবণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

জৈন সাহিত্যে নালন্দা ঃ—জৈন সাহিত্য পাঠে জানা যায়, রাজগৃহের উত্তর-পূর্ব্বদিকে নালন্দা অবস্থিত। নালন্দায় বহুশত অট্টালিকা ছিল। নালন্দায় লেপ নামে জনৈক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক স্তম্ভযুক্ত একটী অতি সুন্দর স্নানাগার ছিল। হস্তীথাম নামক স্থানে একটী উপবন ছিল। একদা যখন গৌতম-বুদ্ধ নালন্দায় বাস করিতেছিলেন, তখন পার্শ্বনাথের শিষ্য উদকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। উদক কর্ম্মফল সম্বন্ধে গৌতম-বুদ্ধের মত জানিবার জন্য তাঁহার সহচরকে পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত সহচর উদকের নিকট ফিরিয়া আসিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, নালন্দা বিহারের

সম্মানিত যাজকগণ পাল্কি-কেদারা ব্যবহার করিতেন ; কিন্তু কখনও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন না।

চৈনিক পরিব্রাজকদিগের বিবরণ ঃ—বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাং বলেন, নালন্দা বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী আম্রবনে একটী পুষ্করিণী ছিল। সেই পুষ্করিণীতে নালন্দা নামে এক নাগরাজ ছিলেন।

হিউয়েন্ সাং-প্রমুখ অনেকে বলিয়া থাকেন, ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধ তাঁহার এক পূর্ব্ব জন্মে বোধিসত্ত্বরূপে উপরোক্ত স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে স্থানে নালন্দা-বিহার স্থাপিত হইয়াছিল, তথায় তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেন। জীবের দুঃখে তাঁহার প্রাণ সদাই ব্যথিত হইত। তাঁহার স্মরণার্থ এই বিহারের নাম নালন্দা রাখা হইয়াছিল।

ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য এবং বজ্র নামক পাঁচজন রাজা নালন্দায় পাঁচটী সংঘারাম বা বিহার নির্ম্মাণ করেন। নালন্দা পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। স্বর্গীয় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ুসারে স্থূলতঃ ইহাই অনুমিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় ৪৫০ অব্দে নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় রাজকর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। তিব্বতীয় বিবরণ ্যারে অবগত হওয়া যায় যে, যেস্থানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিরাট পুস্তকাগারসহ বিদ্যমান ছিল, উহা ধর্ম্মগঞ্জ নামে কথিত
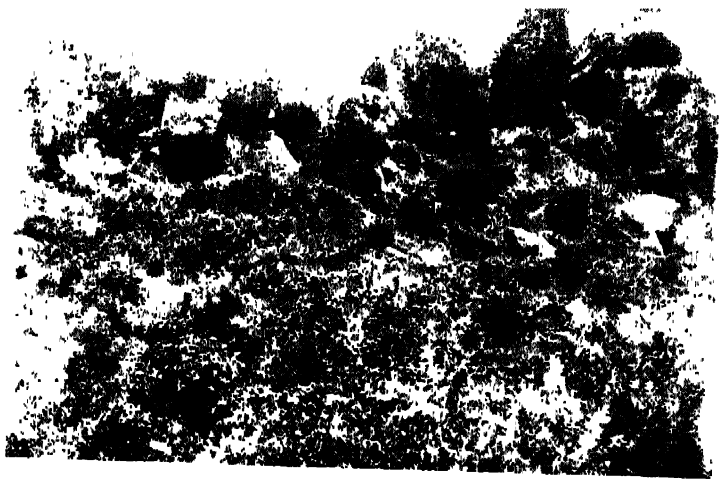
Gridhrakuta caves at Rajgriha. Taken from the hill opposite
(Dark spots are cave mouths)

গৃধ্রকূট গুহা রাজগৃহে । বিপরীত পার্শ্বস্থ পাহাড় হইতে ফটো তোলা হইয়াছে ।
(কাল চিহ্নগুলি গুহা মুখ)

হইত। রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক নামে ইহার তিনটী বৃহৎ হর্ম্ম্য ছিল।

বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান বর্ণনা করিয়াছেন যে, সিরোক পর্ব্বতের এক যোজন বা আট মাইল দূরে "নালো" কুঞ্জ অবস্থিত। ইহা নব রাজগির হইতে সম-দূরবর্ত্তী। কেহ কেহ ইহাই নালন্দার স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পালি-সাহিত্যে নালন্দা রাজগৃহ হইতে আট মাইল ব্যবধানে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বড়গাঁওয়ের ধ্বংসাবশেষকেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নালন্দার স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। এই স্থান রাজগৃহ ও গৃধ্রকুট পর্ব্বত হইতে সাত মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ হিউয়েন সাংয়ের মতে নালন্দা বুদ্ধগয়া হইতে উনপঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। পরিব্রাজক ফাহিয়ানের মতে নালন্দা সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের জন্মস্থান।

তিব্বতীয় গ্রন্থে সারিপুত্রের মাতা ও মাতামহকে নালন্দাবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বড়গাঁওয়ের ধ্বংসাবশেষ—বহুদূরব্যাপী উচ্চ ভূমিখণ্ড ও অসংখ্য ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ—এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। এই সকল সেই সময়কার উচ্চচূড় বৌদ্ধবিহারাদির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান হয়। এখনও এই বহু বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ দেখিলে প্রাচীন মগধের প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিরাট ব্যাপার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা

যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন বৌদ্ধবিহারাদির নির্ম্মাণ ও গঠন প্রণালী যে ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন তাহা সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

মৌর্য্য সম্রাট অশোক তদীয় রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্য-মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার চেষ্টা ও যত্ন সার্থক হইয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নালন্দা বা নরেন্দ্র বিহার মগধের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। অনেকে অনুমান করেন, ইহা মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে এই স্থানে এক অতি সুন্দর আম্রকানন ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এক সময়ে পাঁচশত বণিক উক্ত কানন বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া ভগবান সম্যক-সম্বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। ভগবান সম্যক-সম্বুদ্ধ এই স্থানে তিন মাস অবস্থান করিয়া সকলকে তাঁহার অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন।

নালন্দা বিহারে প্রকৃত জ্ঞানী, প্রতিভাবান্ ও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ছাত্রের অভাব ছিল না। ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞানমিত্র ও শীলভদ্র প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের প্রতিষ্ঠা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের পরিপোষক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৪৫০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ সম্রাট বালাদিত্যের রাজত্ব কালে নালন্দা বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং খৃষ্টীয় অষ্টম

শতক পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব ও গৌরব অক্ষুন্ন থাকে। সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ কমলশীল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে নালন্দা বিহারে বিশাল পুস্তকালয় বিদ্যমান ছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থে এই স্থান ধর্ম্মগঞ্জ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের মধ্যে জিনমিত্র, শীলবুদ্ধ, চন্দ্রপাল, জ্ঞানচন্দ্র, স্থিরমতি, প্রভাকর মিত্র, ধর্ম্মপাল, ভদ্রসেন, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি অধ্যাপকগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিহারে আটটী বিস্তৃত কক্ষ এবং তিন শত প্রকোষ্ঠ ছিল। রত্নসাগর, রত্নোদধি এবং রত্নগঞ্জ নামক তিনটী হর্ম্মে ঐ নামে তিনটী গ্রন্থালয় বিদ্যমান ছিল। ইহাদের মধ্যে রত্নোদধি গ্রন্থালয় নবতলবিশিষ্ট অট্টালিকা বলিয়া বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থালয়ে হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় পুস্তক সংগৃহীত ছিল। তিব্বত প্রদেশে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, নালন্দা বিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমণগণ তীর্থিক সন্ন্যাসীদিগকে অপমানিত করায় তাঁহারা রাগান্বিত হইয়া উক্ত গ্রন্থালয়টী ভস্মীভূত করেন। অষ্টম শতাব্দীতে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহ দশ ভাগে বিভক্ত ছিল। শিক্ষার্থীদিগের বাসের জন্য তিন শত গৃহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে

অবস্থিত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ সম্রাটগণ অন্যূন দুই শত গ্রাম নালন্দা বিহারের উন্নতি-কল্পে দান করিয়াছিলেন। ইহার আয় হইতে বিহারের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ হইত। নালন্দা বিহার কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই বিহারের উন্নতি সাধনে তৎপর ছিলেন। সুবিজ্ঞ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ সদ্ধর্ম্মের পরিপুষ্টির জন্য নালন্দায় ১০৮ সংখ্যক বিহার নির্ম্মাণ করেন।

বৌদ্ধাচার্য্য আর্য্য-অসঙ্গ কিছুকাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, অযোধ্যা নগরে অবস্থান কালে আর্য্য-অসঙ্গ তদীয় শিক্ষাচার্য্য মৈত্রেয়ের নিকট সপ্তভূমিশাস্ত্র যোগাচার ও সূত্রালঙ্কার প্রভৃতি গ্রন্থ শিক্ষা করেন। অনুমান, তিনি ৪৫০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ৫৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত মহাযান সম্বন্ধীয় শাস্ত্রগ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত হয়।

৬২৮ খৃষ্টাব্দে আর্য্যাবর্ত্ত নামক জনৈক চৈনিক বৌদ্ধ চাঙ্গান পরিত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে আগমন করতঃ নালন্দা বিহারে বাস করেন। তিনি অনেক সূত্র চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি কোরিয়ার পূর্ব্বসীমা হইতে নালন্দা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া সত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৬৫০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া নিবাসী হিউয়েনটাই নামক বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক "সর্ব্বতোনদের" উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বত ও নেপাল রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া মধ্য ভারতে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে তিনি বোধিদ্রুম মূলে পূজা করিতে আসেন। তৎপরে তিনি তুখার প্রদেশে প্রত্যাগমন করিয়া টাওহির সহিত সাক্ষাৎ করেন। অবশেষে মহাবোধি সঙ্ঘারামে আগমন করিয়া সেই স্থান হইতেই চীন সাম্রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণে আসিয়া কৌশাম্বী অযোধ্যা নগরের সঙ্ঘারামে গমন করিয়া বৌদ্ধাচার্য্য আর্য্য-অসঙ্গের সহিত অবস্থান করেন। হিউয়েন সাং উক্ত প্রদেশ ভ্রমণ কালে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বারখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশই চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় প্রচলিত আছে।

তুখার প্রদেশবাসী জনৈক বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক চীন সাম্রাজ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ভারতাভিমুখে আগমন করেন। সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ই-ৎসিংহের সহিত উক্ত পরিব্রাজকের নালন্দায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি বহুদিন নালন্দায় অতিবাহিত করিয়া চীন-সাম্রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের পরলোক গমনের পর

ই-ৎসিং ৬৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্তে উপনীত হন। তিনি ৬৭৫ খৃঃ অঃ হইতে ৬৮৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত দশ বৎসরকাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তথায় তিনি চারিশত সংস্কৃত গ্রন্থ ও পাঁচলক্ষ শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে তিনি সুমাত্রা দ্বীপে কিছুকাল অবস্থান করেন।

বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ বর্ষার তিন মাস ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহের তাপস ও পণ্ডিতগণকে দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের আলোচনার জন্য আহ্বান করিতেন। স্থানে স্থানে তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য পান্থশালা ও উদ্যানের সুবন্দোবস্ত থাকিত। পরিব্রাজকগণ চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করিতেন। তাঁহাদের পক্ষে কোনরূপ বাধা বিপত্তি ছিল না। ভগবান সম্যক-সম্বুদ্ধের সময়ে ভারতে বহুপ্রকার ধর্ম্ম ও শিক্ষা সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল।

যুবাবৃদ্ধ সকলেই জ্ঞান আলোচনার জন্য নালন্দা বিহারে আগমন করিতেন। যাঁহারা ত্রিপিটক শাস্ত্র আলোচনা করিতে অসমর্থ হইতেন তাঁহাদিগকে সকলেই হেয়জ্ঞান করিত। যাঁহারা বিচার-শাস্ত্রে জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিতেন, সুদূর স্থান হইতে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইলে যে কোন ব্যক্তি

সম্মান লাভে সমর্থ হইতেন। এই কারণে অনেকেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ দুই শত পঁচিশখানি পল্লী বা গ্রাম উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল এবং এই সকল গ্রাম বৌদ্ধ-সম্রাটগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্রাট বালাদিত্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে ৩০০ ফিট উচ্চ এক সুবৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

দশ সহস্রাধিক ছাত্র উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। অধ্যাপনার জন্য ১৫০০ জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর দশ জন অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহারা পঞ্চাশ প্রকার সূত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকগণ পাঁচশত ত্রিশ প্রকার সূত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর এক সহস্র অধ্যাপক বিংশ প্রকার সূত্র ও শাস্ত্র গ্রন্থে পারদর্শী ছিলেন। পরিব্রাজক হিউয়েন সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক শীলভদ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে পাঁচ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া যোগ, অভিধর্ম্ম, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বক্তিয়ার খিলিজীর আক্রমণের সময় মগধ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ বৌদ্ধ কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংসাবস্থায় আসিয়া

পড়িয়াছিল। গৌড়রাজ **শশাঙ্ক** বৌদ্ধধর্ম্মের অনিষ্ট সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন বলিয়া হিউয়েন সাংয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নিন্দিত হইয়াছেন। তৎকালে মুসলমানগণ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও মুণ্ডিত-মস্তকগণকে যারপরনাই উৎপীড়ন করেন। এই ভাবে মগধ সাম্রাজ্যে চৈত্য, বিহার, সংঘারাম, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যাবতীয় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পরে বিজয়ী মুসলমান কর্ত্তৃক নালন্দা, তক্ষশিলা প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রগুলিও একে একে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা কয়েকজন অধ্যাপকের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে দেওয়া হইল।

মহামতি দিঙ্‌নাগ ঃ—ইনি দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী প্রদেশে সিংহবর্ত্ত গ্রামে উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নাগদত্ত নামক বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আচার্য্য নাগদত্ত বাৎসিপুত্রীনামক হীনযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহামতি দিঙ্‌নাগ ঐ সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত হন। তিনি আচার্য্য বসুবন্ধুর নিকট সমগ্র মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হন ও সুদূর্জ্জয় নামক জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে তর্কশাস্ত্রে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি উড়িষ্যা প্রদেশের ভদ্রপালিত নামক জনৈক রাজমন্ত্রীকে

বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মহামতি দিঙ্‌নাগ একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া শেষে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কালে সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিক পণ্ডিতগণকে তর্কশাস্ত্রে পরাস্ত করিয়া 'শিরোভূষণ' উপাধি লাভ করেন।

মহামতি দিঙ্‌নাগ খৃষ্টীয় ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত হয়। তাঁহার প্রধান গ্রন্থের নাম "প্রমাণ-সমুচ্চয়"।

প্রভাকর মিত্র—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তর্কশাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক প্রভাকর মিত্র জাতিতে বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি চীন সাম্রাজ্যে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তি—ধর্ম্মপালের প্রিয় শিষ্য ধর্ম্মকীর্ত্তি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পবিদ্যা, ষড়ঙ্গবেদ, চিকিৎসাশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তীর্থিক দর্শনে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি ছিল। ব্রাহ্মণগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া তিনি এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধ উপাসকের পরিচ্ছদ ধারণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের গুণ কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া তিনি সমাজচ্যুত হন। তদনন্তর তিনি মগধ সাম্রাজ্যে গমন করতঃ অধ্যাপক ধর্ম্মপালের সম্প্রদায়ে যোগদান করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি ত্রিপিটক শাস্ত্রে অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পাঁচশত সূত্র তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত প্রমাণ-বার্ত্তিক-বৃত্তি নামক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

তিনি কালপীণাক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহা নালন্দার চারি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল।

ভগবান সম্যক-সম্বুদ্ধের দ্বিতীয় শিষ্য মহা-মৌদ্‌গল্যায়ন নালন্দায় জন্মগ্রহণ করেন। পুরাতত্ত্ববিদগণের মতে নালন্দার দক্ষিণ-পশ্চিমে দেড় মাইল ব্যবধানে কোলিত নামক স্থানে মহা-মৌদ্‌গল্যায়নের জন্ম হয়।

প্রজ্ঞাভদ্র ঃ—তিনি একজন যশস্বী বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি নালন্দা বিহারে অবস্থান করিতেন।

ধর্ম্মপাল—ইনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক খ্যাতনামা অধ্যাপক। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কাঞ্চিপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কাঞ্চিপুরের রাজমন্ত্রী ছিলেন। কাঞ্চিপুরের রাজা ও রাজমহিষী তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং ঐ নগরে ধর্ম্মপালের সম্মানার্থ রাজা ও রাজমহিষী এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপালের বৈরাগ্যভাব উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই সময়েই বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদে

নিযুক্ত হন। তাঁহাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন বলিলেও চলে। প্রবাদ আছে, তিনি ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পদত্যাগের পর তিনি কবি ভর্ত্তৃহরির নিকট পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। 'শিক্ষা-সমুচ্চয়', 'বোধিচর্য্যাবতার' প্রভৃতি তাঁহার রচিত উপাদেয় গ্রন্থ। ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপালের 'শতশাস্ত্র-বৈপুল্য-ব্যাখ্যা' চীন ভাষায় রচিত হয়।

শীলভদ্র—ধর্ম্মপালের লোকান্তর গমনের পর অধ্যাপক শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ইনি উচ্চ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর তিনি 'দণ্ডদেব' নামে বিভূষিত হন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ধর্ম্মপালের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার জন্মস্থান আজ পর্য্যন্ত সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। প্রাচীনতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহার জন্মস্থান বিক্রমপুরস্থ রামপাল নামক গ্রাম। অধ্যাপক শীলভদ্র অসাধারণ দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

৩। পাটলিপুত্র

পাটলিপুত্র মগধ রাজ্যের তৃতীয় বা শেষ রাজধানী। গঙ্গার দক্ষিণ তীরস্থ পাটলিগ্রামে এই নগর নির্ম্মিত হয়। মগধরাজ অজাতশত্রু বৈশালীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রবল বৃজি জাতির আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য সুনিধ ও বর্ষকার নামক দুইজন ব্রাহ্মণ অমাত্যকে পাটলিপুত্রস্থ দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। অজাতশত্রুর পরবর্ত্তী মগধের অধিপতিগণ পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

মৌর্য্য সম্রাট দেবপ্রিয় রাজা অশোকের রাজত্ব কালে পাটলিপুত্র যেমন একদিকে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, তেমনি অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। পাটলিপুত্র রাজধানী হইতে বৌদ্ধ সম্রাট অশোক তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং তাহার সাম্রাজ্যের বহির্দ্দেশে উত্তর-পশ্চিমে পাঁচটী গ্রীকরাজ্যে এবং দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণি প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই রাজধানী হইতে অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের বাণী সমূহ প্রেরিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিরিগাত্রে, স্তম্ভে ও শিলাফলকে খোদিত হইয়াছিল।

এই রাজধানী হইতে অশোক বৌদ্ধ সঙ্ঘের একতা বিধানের জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই তিনি কার্য্যপ্রিয় বিশেষ বিশেষ দিনে জীব হত্যা নিবারণের আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই স্থানেই অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশনে কথাবত্থু নামক অভিধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল।

এই স্থান হইতেই তিনি সিদ্ধার্থের জন্মস্থান লুম্বিনী, বুদ্ধত্বলাভের স্থান বুদ্ধগয়া, বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তণের স্থান সারনাথ ও মহাপরিনির্ব্বাণের স্থান কুশীনগরে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং সেই সকল স্থান দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই সেই স্থানে বহুকারুকার্য্যশোভিত শিলাস্তম্ভ ও ধর্ম্মরাজিকাদি নির্ম্মাণ করাইয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধ যাত্রীদিগের উপকার সাধন করিয়াছিলেন।

মহারাজ অশোকের কর্ম্মতৎপরতায় ভূভারতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে অপূর্ব্ব মিলন সাধিত হইয়াছিল; রাজপথে প্রতি অর্দ্ধক্রোশে সুশীতলছায়াযুক্ত বৃক্ষ রোপিত এবং তৃষ্ণার্থ পথিকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কূপ ও পুষ্করিণী খণিত হইয়াছিল, শ্রান্ত পান্থের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সুমিষ্ট আম্র ও অন্যান্য ফলের বাগান করা হইয়াছিল।

মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী, উপাসক ও

উপাসিকাদিগের নিত্য পাঠের জন্য সর্ব্বোপরি সদ্ধর্ম্মস্থায়িত্ব বিধানের জন্য সুভাষিত বুদ্ধবচন হইতে বিনয়-সমুক্কংস, অরিয় বংসানি, অনাগত-ভয়ানি, মৌনেয্য-সুত্র, মুনিগাথা উপতিস্‌স-পসিন, রাহুলবাদ প্রভৃতি সাতটি সূত্র নির্ব্বাচন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে বহু অর্থব্যয়ে কুক্কুটারাম বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উত্তরকালে এই কুক্কুটারাম বিহার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠে পরিণত হইয়াছিল।

নিলিন্দ-প্রশ্নে পাটলিপুত্রঃ—পালি মিলিন্দপঞ্‌হ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাজা মিলিন্দের রাজত্বকালে হিমালয় প্রদেশের 'সঙ্খেয়্য পরিবেণ' অভিধর্ম্ম এবং পাটলিপুত্রের 'অশোকারাম' সমুদায় ত্রিপিটক শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্থবির নাগসেন 'সঙ্খেয়্য পরিবেণে' সপ্তখণ্ড অভিধর্ম্ম শিক্ষা সমাপ্ত করিলে পর স্থবির আয়ুপাল তাঁহাকে পাটলিপুত্রের কুক্কুটারাম বিহারে যাইয়া স্থবির ধর্ম্মরক্ষিতের নিকট সুচারুরূপে সমুদায় ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিখিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। আচার্য্যের উপদেশানুসারে নাগসেন হিমালয়ের রক্ষিততল হইতে যাত্রা করিয়া পদব্রজে পাটলি-পুত্রের অশোকারামে উপনীত হইয়া স্থবির ধর্ম্মরক্ষিতের নিকট তিন মাসে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

চৈনিক পরিব্রাজকদিগের বিবরণঃ—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিনয়পিটক সংগ্রহের জন্য চৈনিক পর্য্যটক

ফাহিয়ান পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি ভারতের অপর কোথায়ও বিনয়পিটক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। পাটলিপুত্রস্থ মহাযান সঙ্ঘারামে আসিয়া মহা-সঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের সমগ্র বিনয়পিটক দেখিতে পান। এই বিনয়পিটক অতি প্রাচীন ও শুদ্ধ বলিয়া তাঁহার নিকট বর্ণিত হইয়াছিল। তিনি স্থানীয় জনৈক স্থবির প্রমুখাৎ সপ্তসহস্র গাথাযুক্ত সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক লিখিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি এই স্থানে ষট্‌সহস্র গাথাযুক্ত সংযুক্তাভিধর্ম্মহৃদয় শাস্ত্রের এক কপি সংগ্রহ করেন। নির্ব্বাণসূত্র নামক অপর এক অমূল্য গ্রন্থও এই স্থানে সংগৃহীত হইয়াছিল। বিশেষ লাভের মধ্যে তিনি পাটলিপুত্রেই মহাসংঘিক সম্প্রদায়ের সমগ্র অভিধর্ম্মপিটক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল বিবরণ হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত পাটলিপুত্র এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠরূপে পরিগণিত ছিল।

পরবর্ত্তী চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন সাংয়ের সময় পাটলিপুত্র নগর তেমন সমৃদ্ধিশালী ছিল না। বিবিধ কারণে মাত্র মহারাজ অশোকের কীর্ত্তিকলাপের স্মৃতিমাত্র বুকে করিয়া পাটলিপুত্র হিউয়েন সাংয়ের চক্ষে প্রতীয়মান হইয়াছিল।

অশোকানুশাসনে পাটলিপুত্র ঃ—বৌদ্ধ ইতিহাসে

মহারাজ অশোকের গৌরবেই পাটলিপুত্রের গৌরব। তাঁহারই দ্বারা এই স্থানে কুক্কুটারাম বিহার নির্ম্মিত হয়, তাঁহারই প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ-বিদেশে বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয়, তাঁহারই ধর্ম্মপ্রাণতায় পাটলিপুত্র দানে ও দাক্ষিণ্যে পৃথিবীর অগ্রস্থানে পরিণত হয়। আমরা নিম্নে পাটলিপুত্রের নামযুক্ত মহারাজ অশোকের একটি অনুশাসন উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধ ইতিহাসে পাটলিপুত্রের বিশেষত্বের কারণ নির্দ্দেশ করিব।

৫ম গিরিলিপি (গির্ণার পাঠ)—দেবানংপ্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ ঃ—কলাণং দুকরং। যে আদিকরে কলাণস সো দুকরং করোতি। ত ময়া বহু কলাণং কতং। ত মম পুতা চ পোত্রা চ পরং চ তেন য মে অপচং আব সংবটকপা অনুবতিসরে। তথা সো সুকতং কাসতি। যো তু এত দেসং পি হাপেসতি সো দুকতং কাসতি। সুকরং হি পাপং। অতিকাতং অংতরং ন ভূতপ্রুর্বং ধংম-মহামাতা নাম। ত ময়া ত্রৈদসবাসাভিসিতেন ধংম-মহামাতা কতা! তে সবপাসংডেসু ব্যাপতা ধামধিস্টানায় ধংমবঢিয়া হিদসুখায়ে চ ধংমযুতস চ যোন-কংবোজ-গংধারানং রিস্টিক-পেতেণিকানং যে বা পি অংঞে অপরাতা। ভটময়েসু ব বংম্হনিভেসু অনাথেসু বুঢেসু হিতসুখায় ধংমযুতানং অপরিগোধায় ব্যাপতা তে। বংধনবধস পটিবিধানায় অপরিবোধায় মোখায়ে চ ইয়ং অনুবংধং প্রজা [তি বা]

কতাভিকারেসু বা থৈরেসু বা ব্যাপতা তে। পাটলিপুতে চ বাহিরেসু চ নগরেসু সর্বেসু ওরোধনেসু ভাতিনং চ মে ভগিনিনা এ বা পি মে অঞে ঞাতিকা সর্বত ব্যাপতা তে। যো অয়ং ধংমনিস্রিতো তি ব ধংমাধিঠানে তি ব দানসংযুতে তি বা সবতা বিজিতসি মমা ধংমযুতসি ব্যাপতা ইমে ধংমমহামাতা। এতায়ে অথায় অয়ং ধংমলিপী লিখিতা চিরথিতিকা হোতু তথা চ মে প্রজা অনুবতংতু।

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) এইরূপ বলিয়াছিলেন :—কল্যাণকর কার্য্য করা দুষ্কর। যিনি কল্যাণকার্য্যের আদিকারী তিনি দুঃসাধ্য সাধন করেন। তবে আমার দ্বারা বহু কল্যাণকর কার্য্য কৃত হইয়াছে। আমার পুত্র, পৌত্র এবং সংবর্ত্তকল্প পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী সকল অপত্য ইহার অনুবর্ত্তী হইবে। তাহা হইলে আমার বংশধর সুকার্য্য করিবে। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ ইহার অংশবিশেষও পরিবর্জ্জন করে, সে দুষ্কার্য্য করিবে। পাপকার্য্য সুকর। যুগযুগান্ত অতিক্রান্ত হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্ম-মহামাত্র (এ দেশে) ছিল না। আমার অভিষিক্ত হওয়ার ত্রয়োদশ বর্ষে আমার দ্বারা (সর্ব্ব প্রথম) ধর্ম্ম-মহামাত্র নিযুক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মাধিষ্ঠান, ধর্ম্মবর্দ্ধন এবং যবন, কম্বোজ, গন্ধার, রাষ্ট্রিক, পিত্তনিক ও অন্যান্য অপরান্তবাসী ধার্ম্মিকগণের হিতসুখের জন্য তাহারা ব্যাপৃত আছে। দাসকর্ম্মকরাদি কর্ম্মজীবী, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, অনাথ ও বৃদ্ধগণের হিতসুখ বিধানে এবং

ধার্ম্মিকগণের অব্যাহতি সাধনে তাহারা ব্যাপৃত আছে। কারাবন্ধনাবদ্ধ ব্যক্তিদিগের অর্থ প্রতিবিধান, অব্যাহতি ও মুক্তির কার্য্যে, বিশেষতঃ পুত্রকন্যাবহুল, কৃতাধিকার ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধদিগের (হিতসাধনে) তাহারা ব্যাপৃত আছে। পাটলিপুত্রে তথা পাটলিপুত্রের বহির্দ্দেশস্থ নগরসমূহে আমার এবং আমার ভ্রাতা, ভগিনী ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়দিগের যে সকল অবরোধ আছে সর্ব্বত্র তাহারা ব্যাপৃত আছে। আমার ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বত্র যাহা কিছু ধর্ম্মনিঃসৃত অথবা ধর্ম্মস্থাপনকর অথবা দানবিষয়ক ব্যাপার, তৎসমস্ত ব্যাপারে তাহারা ব্যাপৃত আছে। এতদর্থে এই ধর্ম্মলিপি লিখিত হইয়াছে—এই (ধর্ম্মবিধান) চিরস্থায়ী হউক এবং আমার সন্তানসন্ততিগণ তদনুবর্ত্তী হইয়া চলুক।”

৪। বৌদ্ধ যুগে আয়ুর্ব্বেদ

প্রাচীন আর্য্যগণ চিকিৎসাশাস্ত্রকে পঞ্চম বেদরূপে শ্রদ্ধা করিতেন। অথর্ব্ববেদের অন্তর্ভূক্ত করিয়া তাঁহারা এই শাস্ত্রের বহুল উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জীবক কৌমারভৃত্য প্রমুখ যে সকল বৌদ্ধপন্থী চিকিৎসকগণ এই শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহাদের জীবন-চরিত বর্ণনা করিতেছি।

জীবক ঃ—মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসারের রাজত্ব কালে মহামতি জীবক রাজচিকিৎসক ও শল্যকর্ত্তা ছিলেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, অসামান্য অধ্যবসায় এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি চতুর্দ্দশ বৎসরের শিক্ষণীয় বিষয় সাত বৎসরেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ ও উদ্ভিদ্-বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।

বিদায়কালীন গুরুর নিকট পরীক্ষা প্রদান ব্যাপার হইতে বুঝা যায়, তিনি কিরূপ গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষা-মন্দিরে সপ্তম বৎসরের শেষভাগে একদিন তদীয় আচার্য্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"গুরুদেব! আর কতদিন আমায় অধ্যয়ন করিতে হইবে?" আচার্য্য বলিলেন, "বৎস! তোমাকে চারি দিবসের সময় প্রদান করিতেছি, তুমি এই নগরের চতুর্দ্দিকে দুই যোজনের মধ্যে যত তরুলতা, ফলমূল, উদ্ভিদ্ ও খনিজ দ্রব্যাদি দেখিতে পাও সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আমায় বল, উক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে কোন্ কোন্‌টী ভৈষজ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।"

জীবক চারি দিবস পরিভ্রমণ করিয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ঔষধে ব্যবহৃত না হয় এমন কোন জিনিষ পৃথিবীতে নাই।" তদীয় শিক্ষাচার্য্য তাঁহার গভীর জ্ঞানে প্রীত হইয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তোমাকে আর শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে বিরল।"

গুরুর নিকট বিদায় লইয়া জীবক স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি সাকেত নামক গ্রামে উপনীত হইয়া শুনিলেন যে, এক শ্রেষ্ঠীপত্নী শিরঃপীড়ায় সপ্ত বৎসরাবধি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কেবল অর্থ গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, রোগের উপশম করিতে পারেন নাই। জীবক তাঁহার আবিষ্কৃত সামান্য নস্যের দ্বারা শ্রেষ্ঠীপত্নীকে আরোগ্য করেন।

এক সময় মহারাজ বিম্বিসার ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। জীবক নিজ ব্যবস্থা মতে ও তাঁহার আবিষ্কৃত

প্রলেপ প্রদানে বিম্বিসারকে আরোগ্য করেন। ইহার পর হইতেই তিনি রাজচিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন।

অতঃপর জীবক রাজগৃহের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রের কর ভেদ করিয়া দুইটী পোকা বাহির করতঃ তাঁহাকে শিরঃ-পীড়া হইতে আরোগ্য করেন। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষে জীবক প্রথম শল্য-চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

এক সময় বারাণসীতে এক শ্রেষ্ঠীপুত্রের অন্ত্রের একাংশ লম্ফ দিবার সময় গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া যায়। ইহার নিমিত্ত তিনি কোন কঠিন দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারিতেন না। জীবক তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত শ্রেষ্ঠীকুমারের বস্থিদেশ বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রটীকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন। শ্রেষ্ঠীপুত্র অল্প দিনের মধ্যে নিরাময় হইয়া উঠিলেন।

অবন্তীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোত পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি মহারাজ বিম্বিসারকে অনুরোধ করিয়া লিখিলেন, তাঁহার চিকিৎসার জন্য যেন অবিলম্বে জীবককে প্রেরণ করা হয়। অবন্তীরাজকে আরোগ্য করিতে যাইয়া মহামতি জীবকের জীবনান্ত হইবার উপক্রম হয়। রাজার এক অদ্ভুত স্বভাব ছিল যে, তিনি তৈল, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। কিন্তু জীবকের আবিষ্কৃত তৈল ব্যবহারে যখন আরোগ্য হইয়া উঠেন, তখন জীবকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রাজপরিচ্ছদ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে জীবক

স্বীকৃত হন নাই। তথাপি রাজা বহু ধন-রত্ন পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, এক সময় ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধ কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা করিবার জন্য জীবককে আহ্বান করা হয়। জীবক তিনটী পদ্মের মধ্যে তাঁহার আবিষ্কৃত মৃদু বীর্য্য ঔষধ রাখিয়া সম্যক্-সম্বুদ্ধকে উক্ত সুগন্ধ নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ লইতে বলেন। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান্ কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করেন।

অন্য এক সময় দেবদত্ত ভগবান্ বুদ্ধকে হত্যা করিবার নিমিত্ত এক পাষাণ নিক্ষেপ করেন। উক্ত পাষাণের এক খণ্ড বুদ্ধের পায়ে লাগায় সেই স্থানে ক্ষত হয়। তখন জীবকের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার উপাধি ছিল 'কৌমারভৃত্য'; পালি নাম 'কোমারভচ্চ'।

এই মহাপুরুষের চিকিৎসাতত্ত্বের কতকগুলি বিস্ময়কর বিবরণ ব্যতীত তল্লিখিত অন্য কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এইরূপ অনেক কৃতবিদ্য প্রাচীন চিকিৎসকের প্রণীত কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতারাশি প্রায় বিলুপ্ত অথবা ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যদিও আমরা তাঁহাদের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধানের সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি না তথাপি আমরা বৌদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেখিতে পাই, মহামতি বাগভট্ট,

নাগার্জ্জুন, চক্রপাণি, সিদ্ধ নাগার্জ্জুন, বৃন্দমাধবকর ও ভাবমিশ্র প্রভৃতি বৌদ্ধ চিকিৎসকগণ ভারতবর্ষে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বাগ্‌ভট ঃ—মহামতি বাগ্‌ভট শকরাজ চষ্টনের রাজত্ব কালে 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়' নামক এক বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার-বিদ্যা, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র এই অষ্টাংশে তাঁহার গ্রন্থ বিভক্ত। তথায় মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুত প্রক্রিয়া বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া ধাতু শোধন, মারণ প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও লবণ, যবক্ষার, খাজি ধাতু প্রভৃতির বিশদ্‌রূপে পরীক্ষা করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অষ্ট অঙ্গ

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে সচরাচর নিম্নোক্ত অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করা হয়। যথা,—

১। শল্য চিকিৎসা ঃ—কেশ, নখ প্রভৃতি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লৌহ, ধূলি ইত্যাদি প্রবিষ্ট হইলে তাহা বহির্গত করিবার প্রণালী।

২। শালাক্য ঃ—চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি স্থানের রোগসমূহের বর্ণনা ও চিকিৎসা প্রণালী।

৩। কায়-চিকিৎসা ঃ—জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোথ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা প্রণালী।

৪। ভূতবিদ্যা :—দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ প্রভৃতির শান্তি-কর্ম্ম।

৫। কৌমার বিদ্যা :—শিশু-পালন, ধাত্রী-বিদ্যা, দুগ্ধের শোধন, বালরোগ প্রভৃতির চিকিৎসা প্রণালী।

৬। অগদতন্ত্র :—সর্প, কীট, বৃশ্চিক প্রভৃতির দংশন জনিত রোগের চিকিৎসা।

৭। রসায়নতন্ত্র :—যাহাতে আয়ু বৃদ্ধি হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায় তদ্‌বিষয়ে চিকিৎসা।

৮। বাজীকরণতন্ত্র :—শুক্রের শোধন, শুক্রবর্দ্ধন প্রভৃতির উপায় নির্দ্ধারণ।

আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গের বিষয় বিশদ্‌রূপে বর্ণিত আছে বলিয়াই বাগ্‌ভট প্রণীত গ্রন্থের নাম 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়'। বাগ্‌ভট তাঁহার 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের' উপসংহারে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

"অভিধাতৃবশাৎ কিংবা দ্রব্যশক্তির্বিশিষ্যতে।
অতো মৎসরমুৎসৃজ্য মাৎসর্য্যমবলম্ব্যতাম্॥
ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্তা চরক-সুশ্রুতৌ।
ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদগ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥
হৃদয়মিব হৃদয়মেতৎ সর্ব্বায়ুর্ব্বেদবাঙ্ময়পয়োধঃ।
দৃষ্ট্বা যচ্ছুভমাপ্তং শুভমস্তু পরং ততো জগতঃ॥"

"দৈবানুগ্রহ হইতে দ্রব্যশক্তি বড়। অতএব মাৎসর্য্য বা বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থভাব অবলম্বন পূর্ব্বক

(বিচার করা) কর্ত্তব্য। যদি ঋষিপ্রণীত ও পুরাতন বলিয়া শাস্ত্রের প্রতিপত্তি হয়, তবে চরক ও সুশ্রুত বর্জ্জন করিয়া ভেড়্‌সংহিতাদি প্রাচীনতর শাস্ত্র পাঠ করা হয় না কেন? তাই (আমরা বলি) সুভাষিত শাস্ত্রের প্রমাণ গ্রাহ্য (পুরাতনের নহে)। আমাদের এই অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সর্ব্বায়ুর্ব্বেদের হৃদয় এবং বাঙ্ময়পয়োধিস্বরূপ। এই গ্রন্থ দৃষ্টে যেই শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা অপরের তথা সকল বিশ্বের পক্ষে শুভকর হউক।"

বৌদ্ধ চিকিৎসক মহামতি বাগ্‌ভটের সময়েই অস্ত্র চিকিৎসার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে আয়ুর্ব্বেদে শল্য চিকিৎসার অবনতির সূচনা হয়। মনু হিন্দুসমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার সংহিতাতে তিনি আচার-ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসাশাস্ত্র হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষ হইতে আজ বিলুপ্ত হইবার কারণ তিনি বলেন যে, হিন্দুরা মনে করেন, মৃত দেহ স্পর্শ করিলে দোষ বা পাপ হয়।

বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন ঃ—মাধ্যমিক দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভাবন-কর্ত্তা বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিদর্ভের অন্তর্গত মহাকৌশল নামক স্থানে নাগার্জ্জুন জন্ম গ্রহণ করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, কৃষ্ণানদীর তীরে শ্রীপর্ব্বতের এক গুহায় অনেকদিন যাবৎ তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। নাগার্জ্জুন নব্য

রসায়নের জন্মদাতা। তিনি মাধ্যমিক-সূত্র প্রণেতা। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব নামে সুপরিচিত। তিনি বহুবিধ তির্য্যক্ পাতক প্রক্রিয়া এবং ধাতুর জারণ-মারণ প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া অন্যান্য রাসায়নিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। চক্রপাণি লৌহমারণ বর্ণনা কালে উহা বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 'রসরত্নাকরে' (বোম্বে সংস্করণের ৪র্থ পৃষ্ঠায়) বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুনকে একজন রসবিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া মহাযান প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন যে, রাসায়নিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রপাবদর্শী, সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে এবং তিব্বতী ও চীনা ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

হিউয়েন সাং বলেন, বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নাগার্জ্জুন তন্ত্র, নাগার্জ্জুনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, যোগরত্নাবলী, কৌতূহল চিন্তামণি, পক্ষপুট, নাগার্জ্জুনীয় নাগার্জ্জুন, রসরত্নাকর, আরোগ্যমঞ্জরী, রসেন্দ্রমঙ্গল প্রভৃতি তাঁহারই প্রণীত। এই নাগার্জ্জুন ব্যতীত অন্য একজন নাগার্জ্জুনের নাম পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বিদর্ভরাজ ভোজভদ্র তাঁহার নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে

দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ভোজভদ্র খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৬ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন।

সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় লামা তারনাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে নাগার্জ্জুনের চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা সম্বন্ধে বিস্তর কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। কেহ কেহ বলেন, নাগার্জ্জুন হর্ষের সামসময়িক, অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, তিনি কণিষ্কের সময় বিদ্যমান ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার জন্মকাল সঠিক নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তাহা হইলেও তিনি যে অসাধারণ রাসায়নিক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুশ্রুতের সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদে ছয়টি ধাতুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, শীষক ও লৌহ। শার্ঙ্গধর এবং তাঁহার টীকাকার নয়টি ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—তাম্র, রৌপ্য, পিতল, শীষক, স্বর্ণ, লৌহ, কাংস্য, বৃত্ত ও লৌহ। সূর্য্য প্রভৃতি নবগ্রহ হইতে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে, তাঁহারা এইরূপও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চরক :—পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি চীনা ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক গ্রন্থের আলোচনাকালীন চরক নামক জনৈক চিকিৎসকের সন্ধান প্রাপ্ত হন। চরক রাজা কণিষ্কের দীক্ষাগুরু ছিলেন। রাজা কণিষ্কের রাজত্বকাল দ্বিতীয় শতাব্দী। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, চরক দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। আরবীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রাজেস্

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে ভারতবর্ষের 'সিদ্ধিচয়' নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে কয়েকটি বিষয় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, এই 'সিদ্ধিচয়' একমাত্র চরকের দ্বারাই প্রণীত। রাজেস্ ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধশাস্ত্র মতে মাগধি চিকিৎসা—বর্ত্তমানে শিশু চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ চিকিৎসকগণ মাগধি বা বৌদ্ধশাস্ত্র মতে বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রোগে আশ্চর্য্য ফল লাভ করিতেছেন। বোধ হয় এইরূপ চিকিৎসা বৌদ্ধ যুগ হইতে পুরুষ-পরম্পরা তাঁহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল ঔষধ শিশু রোগের পক্ষে অমোঘ।

প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চক্রপাণি, বৃন্দমাধবকর ও ভাবমিশ্রের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চক্রপাণির প্রধান গ্রন্থের নাম 'চক্রদত্ত', বৃন্দের প্রধান গ্রন্থের নাম 'সিদ্ধিযোগ'। তাঁহারা উভয়েই বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন-প্রবর্ত্তিত বিবিধ চিকিৎসা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসমূহের অনুকরণ করেন।

চক্রপাণির সংস্কৃত চিকিৎসাগ্রন্থে নাগার্জ্জুনাঞ্জন ও নাগার্জ্জুনযোগ প্রভৃতি ঔষধের উল্লেখ দেখা যায়। চক্রপাণির পিতা নারায়ণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশের রাজা ভয়পালের রাজচিকিৎসক ও পাকশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। চক্রপাণির নিবাস রাঢ়ের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে। তিনি ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। চক্রপাণি ও বৃন্দমাধব তান্ত্রিক যুগের অর্থাৎ নবম ও একাদশ শতাব্দীর লোক

হইলেও তাঁহাদের সময় ধাতুঘটিত ঔষধসকল আভ্যন্তরিক প্রয়োগে তাদৃশ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। উভয়েই বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুনের আবিষ্কৃত 'কজ্জলী' ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। 'বৈদ্য-শব্দ-সিন্ধুর' প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়, চক্রপাণি ভারতের 'পেরাসালেস্' নামের অধিকারী। তাঁহার সময় হইতেই ধাতু-ঘটিত ঔষধ বহুল পরিমাণে ব্যবহারের চেষ্টা দেখা যায়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁহার অনুবাদিত সতিপট্‌ঠান-সূত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্তই ধ্যানপ্রসূত। স্মৃতির অনুশীলন করিতে গিয়া বৌদ্ধসাধকগণ মানব-শরীরের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, শরীরের মধ্যে লোম, নখ, দন্ত, ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বুক্ক, হৃদয়, যকৃত, ক্লেদ, প্লীহা, ফুসফুস্, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রঅন্ত্র, উদর, পুরী, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁয, শোনিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষের, সিক্নী, নাসিকা, মূত্র ও মস্তিষ্ক—এই ৩২ প্রকার ধাতু আছে।

মৃতদেহের পরিণাম ভাবিতে গিয়া তাঁহারা অনেকগুলি অস্থির নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—হস্তাস্থি, পদাস্থি, উদরাস্থি, কটিঅস্থি, পৃষ্ঠকণ্ট ও শিরকটাস্থি। শরীরতত্ত্ব জানবার নিমিত্ত শব-ব্যবচ্ছেদ করিবার কোন প্রয়োজন মনে না করিলেও অনিত্য ভাবিবার উপায়স্বরূপ মৃতদেহকে না পোড়াইয়া তৎপরিবর্ত্তে সিশথিকা বা অসুখশশ্মানে নিক্ষেপ

করিয়া তাঁহারা দিন দিন উহার অবস্থা অবলোকন করিতেন। ক্রমে উহার রক্তমাংসসমন্বিত ও স্নায়ুবিজড়িত অস্থিগুলি ছিন্নবিছিন্ন হইয়া শঙ্খের ন্যায় শ্বেত বর্ণ ধারণ করিত।

সতিপট্‌ঠান-সূত্র ব্যতীত আরও অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে চিকিৎসা বিষয়ে অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। নিম্নে আমরা বিনয়পিটক হইতে একটী মাত্র ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিব।

এক সময়ে ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার কয়েকজন শিষ্য পীড়িত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। আহার্য্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবামাত্রই তাঁহাদের বমন হইত। ভিক্ষুদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহার প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলিলেন, "দেখ আনন্দ! আমি তাহাদের রোগ নিবারণার্থ ভৈষজ্য সংগ্রহ করিতেছি। তুমি তাহাদের প্রকৃত রোগ কি জানিয়া আসিবে।" আনন্দ পীড়িত ভিক্ষুদিগকে পরীক্ষা করিয়া ভগবান্‌কে বলিলেন, "তাঁহাদের শারদীয় ঋতু সহ্য হইতেছে না। বর্ষাবাসের সময় কঠিন মানসিক পরিশ্রম করাতেই তাঁহাদের পিত্ত কোপিত হইয়াছে এবং শরৎকালীন শীতলতা ঐ কোপিত পিত্তকে গাঢ় করিয়া শরীরের বসা নামক যে ধাতু আছে, উহাকে বিধ্বংস করিয়াছে। তাই তাহাদের এই রকম বমন হইতেছে।" ভগবান্ সম্যক্-সম্বুদ্ধ নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিবার নিমিত্ত

সেই পীড়িত ভিক্ষুদিগকে আদেশ প্রদান করেন। কথিত আছে, ভগবানের নির্দ্দেশ মতে এই সকল ঔষধ সেবন করিয়া তাঁহারা শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

১। পঞ্চ ভৈষজ্য—ঘৃত, নবনীত, মধুফনিত, অশ্ববসা, মৎস্যবসা, শশকবসা, শূকরবসা, গর্দ্দভবসা, এই সমস্ত একত্র করিয়া সিদ্ধ করতঃ ঔষধ প্রস্তুত করা।

২। মূল ঔষধ—হরিদ্রা, শিংগ্রীর, কালবচ্ (পালি, অতিবংশ), কটুকবাহিনী (পালি, বদ্ধমতিকং উচিক), এই সকল মূল ঔষধ একত্র সিদ্ধ করতঃ পাচন প্রস্তুত করা।

৩। ত্রিকটু কষায়, পটক কষায়, পস্‌গ কষায়, মর্ত্তমান কষায় সংযোগে অন্যতম পাচন প্রস্তুত করা।

৪। নিমপত্র, কুটপত্র, পটলপত্র, তুলসীপত্র, কার্পাসপত্র, এই সকল একত্র করিয়া পাচনরূপে ব্যবহার করা।

৫। বিদড়, পিপুল, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, জায়ফল প্রভৃতির দ্বারা আসব প্রস্তুত করা।

৬। জতু সংযুক্তবটী—হিং, হিঙ্গুল, টিপাটিত, হিং বৃক্ষের শুষ্ক পত্র প্রভৃতির সহিত শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া বটি প্রস্তুত করা।

৭। সমুদ্রের লবণ, কাল লবণ, উদ্ভিদ্ লবণ ইত্যাদি সংযোগে অন্য প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করা।

ব্রহ্মজাল-সূত্রে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধেও কতিপয় বিষয় উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে বমন বিরেচন, উর্দ্ধ বিরেচন,

কর্ণতৈল, নেত্রতৈল ও নস্য প্রস্তুতকরণ, শালাক্য অস্ত্র-চিকিৎসা, শিশু-চিকিৎসা, বিষ-চিকিৎসা প্রভৃতিরও নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত সূত্রে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ভাগ-বিভাগ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তথাপি আমরা বেশ মনে করিতে পারি যে, বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এদেশে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অষ্ট ভাগে বিভক্ত ছিল না।

উত্তর-অধ্যায়-সূত্র নামক একটী প্রাচীন জৈন গ্রন্থে মাত্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের চারি ভাগের উল্লেখ দেখা যায়। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক জগতে নানারকম আশ্চর্য্য ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের মূলেই রহিয়াছে চিকিৎসা শাস্ত্র। বৌদ্ধ চিকিৎসকগণ এই শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল বটে, কিন্তু উহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বৌদ্ধ চিকিৎসক দ্বারা। উপরোক্ত বিবরণ পাঠে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বৌদ্ধ যুগের চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ বর্ত্তমানে বিশেষ সম্মান লাভ করিতেছে। মোটের উপর দেখিতে পাই, ভিষক্‌কুলতিলক মহামতি জীবক উদ্ভিদ্‌বিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, এবং তিনি যে শল্যচিকিৎসায়ও বিশেষ নিপুণ ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী মহামতি বাগভট্ট নানাবিধ ধাতু-ঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করেন।

দৃঢ়বল ও মাধবকর রোগনিদানের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের পরে বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন ধাতু গঠন, জারণ, মারণ, প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি রাসায়নিক তত্ত্ব আবিস্কার করেন।

মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালে চিকিৎসা-শাস্ত্রেরও অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, ভৈষজ্যাগার নির্ম্মাণ এবং ভৈষজ্য-গুল্মলতাদি সংগ্রহ বিষয়ে মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

পশুচিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় প্রভৃতির ব্যবস্থাও নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করিবার বিশেষ সুযোগ ছিল। এসম্বন্ধে বৌদ্ধ পালিগ্রন্থে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধ যুগে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র খুব সমাদৃত হইত। অশোকের যত্ন ও তৎপরতায় তক্ষশীলা, বারাণসী, শ্রীধান্যকটক, নালন্দা প্রভৃতি এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে যুক্ত ছিল।*

চিকিৎসার দ্বিবিধ পদ্ধতি—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক বিজিত রাজ্যের প্রত্যেক স্থানে, এমন কি, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেতলপুত্র, তাম্রপর্ণি পর্য্যন্ত এবং গ্রীকরাজ আন্টিওকাসের রাজ্যে সর্ব্বত্রই চিকিৎসার দ্বিবিধ পদ্ধতির

* শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রণীত 'অশোক' দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থা করেন—মনুষ্যের জন্য চিকিৎসা এবং পশুদিগের জন্য চিকিৎসা।

এতদ্ব্যতীত তিনি মনুষ্যদিগের এবং পশুদিগের উপযোগী সর্ব্বপ্রকারের ঔষধও বিতরণ করিতেন। যে যে স্থানে ঔষধের আয়োজন ছিল না, সেই সেই স্থানে এখন হইতে ঔষধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান বর্ত্মে মনুষ্য ও পশুদিগের জন্য কূপ খনন এবং বৃক্ষ সকল রোপিত হয়। †

ভারতবর্ষে স্বর্ণের উৎপত্তি

কাশ্মীর সুবার অন্তর্গত পকিলী নামক স্থানে নদীর স্রোতে প্রথমে লম্বা লম্বা ছাগচর্ম্ম বিছান হইত, এবং জলের স্রোতে যাহাতে উহা ভাসাইয়া লইয়া না যায়, সেই জন্য পাথর চাপা দেওয়া হইত। দুই তিন দিবস পরে চর্ম্মগুলি সযত্নে তুলিয়া রৌদ্রে শুকানো হইত এবং উহা হইতে স্বর্ণ পাওয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত পার্ব্বত্য প্রদেশেও স্বর্ণের খনি ছিল। আবার নদীর বালুকা এবং মৃত্তিকাতেও স্বর্ণ পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ প্রাচীন রাসায়নিকদিগের প্রথায় ও নাগার্জ্জুনের বিশেষ চেষ্টায় লৌহ, তাম্র প্রভৃতি হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা হইত। আইন-ই-আকবরীতে বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুনকৃত এক

---

† শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বিহারী সেন মহোদয়ের 'অশোক চরিত', দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রকম পরশ পাথরের উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া গন্ধককে পলাশের রসের দ্বারা শোধিত করিয়া রৌপ্যের সহিত তিনবার ঘুঁটের আগুনে পুটপাক করিলে রৌপ্যকে স্বর্ণে পরিণত করা যায়। * নাগার্জ্জুনের রসরত্নাকর নামক গ্রন্থের অনেক শ্লোকে এইরূপ কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত-প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশের বৌদ্ধাচার্য্যগণ এবং প্রতীচ্য দেশীয় রাসায়নিকগণ সকলেই ধাতুর জারণ ও মারণ সম্বন্ধে একমত। কিন্তু দার্শনিকগণের মতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে শোধন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছিল। বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন স্বর্ণ প্রস্তুত-প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলিয়া গিয়াছেন। যথা ঃ—

কিমত্র চিত্রং যদি রাজবর্ত্তকং
শিরীষ পুষ্পাগ্ররসেন ভাবিতম্।
সিতং সুবর্ণং তরুণার্ক সন্নিভং
করোতি গুঞ্জাশতমেক গুঞ্জয়া।

(রসরত্নাকর—নাগার্জ্জুন)

"রাজাবর্ত্ত শিরীষ পুষ্পাগ্ররসে সিদ্ধ হইলে উহা একগুঞ্জ পরিমাণ রৌপ্যকে শত গুঞ্জ পরিমাণ তরুণ অরুণসন্নিভ স্বর্ণে পরিণত করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?"

কিমত্র চিত্রং যদি পীত গন্ধকঃ
পলাশ নির্য্যাসরসেন শোধিতঃ।

* ভাবপ্রকাশ—১৪৬ পৃঃ

আরণ্য কুরুৎ পলকৈস্তু পাচিতঃ
করোতি তারং ত্রিপুটেন কাঞ্চম্।

(রসরত্নাকর—নাগার্জ্জুন)

"পীত গন্ধক পলাশ-নির্য্যাস দ্বারা শোধিত হইলে এবং আরণ্যক উৎপলের সহিত তিন বার পুটপাকে পাচিত হইলে রৌপ্যকে স্বর্ণে পরিণত করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?"

তান্ত্রিক পারদ—রাসায়নিকগণ পারদের মারণ এবং শোধন দ্বারা স্বর্ণে পরিণত করণের ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি হইতে ইহার কতেক আভাস পাওয়া যাইবে।

বজ্রদন্তঃ সুদন্তশ্চ লোহদন্ত স্তথৈবচ।
ত্রয়ো বিনা ওষধয়ে রসস্য মারণে হিতা॥
তান্নিবোধ সমাসেন যথা জানন্তি সাধকাঃ
বজ্রদন্তস্তু বজী স্যাৎ লৌহদন্তং পুটং বিড়ঃ॥
সুদন্তং ব্রহ্মদন্তং চ সমাসাৎ কীর্ত্তিতং তব।
গ্রাহয়েতং সমাসেন সাধকো হৃষ্টমানসঃ॥
তদ্রসং রসসংযুক্তং একীকৃতং তু মর্দয়েৎ।
অন্ধ মূষাগতং ধ্মাতং ম্রিয়েৎ তৎক্ষণাৎ॥
সহস্রবেধী কর্ত্তা চ জায়তে স মহারসঃ
মূষাং সংলেপয়েৎ তেন পূরাগৃহ্য মহৌষধিঃ॥

(কাক-চণ্ডেশ্বরীমত-তন্ত্র)

"বজ্রদন্ত, সুদন্ত, লৌহদন্ত, ব্রহ্মদন্ত, পুটদ্বারা বিড় করিবে। উহার রসের সহিত পারদ সংযোগ করিয়া মর্দ্দন

করিবে। তৎপর বযমূরা যন্ত্রে (মুচি) স্থাপন করিয়া পাক করিলে পারদের মারণ ক্ষণমধ্যেই হয়। এই পারদ এক্ষণে মহারস সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। ইহা সহস্রবেধী অর্থাৎ সহস্রগুণ হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে।”

অন্যান্য রসায়নসংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে পারদের এবম্বিধ গুণ-সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা :—

চতুঃ যষ্ঠংশতৌ বীজ প্রক্ষেপো মুখমুচ্যতে।
এবঙ্কৃতে রসো গ্রাস লোলুপো মুখবান্ ভবেৎ।
মুখস্থিত রসেনাল্প লোহস্য দসনৎ খলু।
স্বর্ণরূপ্যত্ব জননং শব্দবেদধঃ স কীর্ত্তিতঃ॥

(রসরত্ন-সমুচ্চয়)

“চতুঃষষ্ঠাংশ বীজ প্রক্ষেপকে মুখ বলে। এইরূপ করিলে পারদ গ্রাস লোলুপ মুখযুক্ত হয়। এইরূপ মুখযুক্ত পারদের সাহায্যে অল্প পরিমাণ ধাতুকে রৌপ্যে বা স্বর্ণে পরিণত করাকে শব্দবেধ বলে।”

পাশ্চাত্য প্রাচীন রাসায়নিকগণও পারদের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎকালে পারদের অলৌকিক গুণসম্বন্ধে সর্ব্বদেশেই একমত ছিল। এ দেশে বহু রাসায়নিক পারদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নাগার্জ্জুন তাঁহার ‘রসরত্নাকরে’ বলিয়াছেন :—

রসং হেমসমং মর্দ্দ্যংপীঠিকা গিরিগন্ধকম্।
দ্বিপদী রজনীরম্ভাং মদয়েৎ টঙ্কণান্বিতাম্॥

নষ্ট পিষ্টঞ্চ অন্ধ মূষ্যাং নিধাপয়েৎ।
তুষাল্লঘুপুটং দত্ত্বা যাবৎ ভস্মত্বমাগতঃ॥
ভক্ষণাৎ সাধকেন্দ্রস্তু দিব্য দেহমবাপ্নুয়াৎ॥

"সমপরিমাণ স্বর্ণ পারদের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে গিরি, গন্ধক, সোহাগা ইত্যাদির সহিত পুনঃ মর্দ্দন করিবে। এইরূপে নষ্ট পিষ্ট পারদকে (মুচিতে) আবদ্ধ করিয়া তুষানলে যতক্ষণ না ইহা ভস্মে পরিণত হয় ততক্ষণ লঘু পুটপাক করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

ভারতবর্ষের বাহিরে আয়ুর্ব্বেদের বিস্তার

প্রাচীন বৌদ্ধ যুগ হইতেই ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধাচার্য্যগণ মানবের শারীরিক ভিন্ন ভিন্ন রোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন ও প্রচার করিতেন। মানবের কল্যাণার্থ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সমগ্র এসিয়ায় কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও বিদ্যমান আছে। মধ্য-এসিয়ায় চীন দেশের অন্তর্গত কাসগড়ের একটি বৌদ্ধ স্তূপ হইতে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুথি আবিষ্কার করা হইয়াছে। আবিষ্কারকের নামানুসারে এগুলিকে বাওয়ার পুথি বলে। ভূর্জ্জপত্রে লিখিত এই পুথিগুলি গুপ্তযুগের প্রচলিত অক্ষরে লিখিত, সুতরাং ইহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী। এই পুথিগুলির মধ্যে সাতখানি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত

গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে চারিখানি আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলির ভাষা চরক সুশ্রুতের ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীন। বাওয়ার পুথি অপেক্ষাও প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ পুথি মধ্য-এসিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। ম্যাকাট্রনি যে পুথি আবিষ্কার করেন, তাহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল।

সিংহলে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার

মহারাজ অশোকের সময় হইতেই সিংহল প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সিংহলের রাজা বুদ্ধদাস স্বীয় রাজ্যে চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। 'সারথ-সংগ্রহ' নামে তিনি একখানি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থও রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'যোগার্ণব' নামে আর একখানি গ্রন্থ লিখিত হয়। পরে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ অবলম্বনে বহু গ্রন্থ সিংহলী ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

তিব্বতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চারিখানি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। তিব্বতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিব্বত হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মঙ্গোলিয়ান্ ও হিমালয় পর্ব্বত-

বাসী লেপ্‌চা প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত হয়। তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ বিভিন্ন মঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আরব ও পারশ্যদেশে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র

শাসানিয়ান ও আব্বাসাইতদিগের রাজত্বকালেই সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয়। তৎপরে আরবী ভাষায় বহু আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের অনুবাদ হয়। চরক ও সুশ্রুত ব্যতীত এখন এমন অনেক ভারতীয় গ্রন্থকারের রচনা উক্ত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, যাহাদের মূল সংস্কৃত এখন আর পাওয়া যায় না। এই সব গ্রন্থকারের নামও উক্ত অনুবাদগুলিতে দেওয়া আছে। কিন্তু পারসী ও আরবী ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থগুলি এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে, উহাদের ভারতীয় মূল এখন উদ্ধার করা অসম্ভব। আবু মন্‌সূর মুয়াফ্‌ফক নামক পারশ্য দেশীয় এক গ্রন্থকার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে অধুনা-অজ্ঞাত বহু সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ দেখা যায়। মন্‌সূর 'শ্রীফরগবদৎ' নামক গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যে 'শ্রীভার্গদত্তের' পারসী সংস্করণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আরব ও পারশ্যের মধ্য দিয়া ইউরোপেও আয়ুর্ব্বেদের

প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীক্ দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র যে কোন কোন বিষয়ে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের নিকট ঋণী, একথা পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে এই ঋণের পরিমাণ কাহারও মতে খুব বেশী, আবার কাহারও মতে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু মোটের উপর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যে গ্রীক্ দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত আরব দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রভাব ইউরোপেও খুব বেশী ছিল, সুতরাং প্রকারান্তরে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাবও স্বীকার করিতেই হইবে। আরব দেশীয় 'ইবন-সিনা-আল্‌রাজি' প্রভৃতি গ্রন্থের লাটিন্ অনুবাদেও চরক সংহিতার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মালয় দ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার

ভারতবর্ষের বাহিরে যেখানে যেখানে ভারতবাসীরা উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইখানেই আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইরূপে ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যাম, কম্বোডিয়া, সুমাত্রা, যাভা প্রভৃতি দেশেও আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হয়। এই সকল দেশে আয়ুর্ব্বেদের কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহার কিছু পরিচয় তদ্দেশীয় শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়। কম্বোজরাজ যশোবর্ম্মণের শিলালিপিতে তাঁহার গুণ বর্ণনাকালীন এইরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ—

সুশ্রুতোদিতয়া বাচা সমুদাচার সারয়া
একো বৈদ্যঃ পরত্রাপি প্রজাব্যাধীন্ জহার যঃ।

"বৈদ্য সুশ্রুতের মতানুসারে ব্যবস্থা করিয়া ইহকালে প্রজা ব্যাধি হরণ করে। কিন্তু রাজা শাস্ত্রসম্মত ও সারবান্ বাক্যের দ্বারা প্রজাগণকে ইহকাল ও পরকালের ব্যাধি হইতে রক্ষা করেন।"

সুশ্রুতের সহিত তুলনায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে (খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে) কম্বোজ দেশে 'সুশ্রুত-সংহিতা' অতিশয় সুপরিচিত ছিল। তারপর অষ্টম জয়বর্ম্মণের রাজত্ব কালে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আয়ুর্ব্বেদ মতে বহু দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শ্যাম ও কাম্বোডিয়ার বিভিন্ন স্থানে আটখানি শিলালিপিতে এইরূপ আটখানি দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। একখানি শিলালিপির কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাদ্বারা জয়বর্ম্মণের কল্পনা ও কার্য্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। রাজার গুণ বর্ণনাচ্ছলে উক্ত হইয়াছে ঃ—

আয়ুর্ব্বেদাস্ত্র বেদেষু বৈদ্যবীরৈর্বিশারদৈঃ
যোঽঘাতষদ্ রাষ্ট্ররুজো রুজারীন্ ভেষজায়ুধৈঃ।

"আয়ুর্ব্বেদরূপ অস্ত্রবেদে বিচক্ষণ বৈদ্যবীরগণের দ্বারা ঔষধরূপ অস্ত্রের সাহায্যে তিনি রাজ্যের পীড়া সংহার করিয়াছিলেন।" কারণ—

দেহিনাং দেহ রোগোয়ন্মনো রোগরুজস্তরাং
রাষ্ট্র দুঃখং হি ভর্ত্তৃনাং দুঃখং দুঃখং তু নাত্মনঃ।

"রাজ্যের দুঃখেই রাজার দুঃখ, রাজার নিজের দুঃখে নহে। আবার দেহ-রোগ হইতেই মনের রোগ উপস্থিত হয়। সুতরাং দেহ-রোগেই রাজ্যের দুঃখ।" অতএব—

স ব্যাধাদিদমারোগ্য শালং স সুগতালয়ং
ভৈষজ্য সুগতঞ্চেহ দেহাম্বর হৃদিন্দুনা।

"তিনি একটি বৌদ্ধ মন্দির ও আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করিলেন।" এখানকার ব্যবস্থা—

চিকিৎসা অত্র চত্বরো বর্ণা দ্বৌ ভিষজৌ তয়ো
পুমানেকঃ স্ত্রিয়ৌ চ দ্বে একশঃ স্থিতিদায়িনঃ।

"এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেরই চিকিৎসা হইবে। দুইজন ভিষক্ থাকিবেন। প্রতি ঘরে পুরুষ হইলে একজন, ও স্ত্রীলোক হইলে দুইজন, রোগী (স্থিতিদায়িন ?) থাকিবে।"

৫। বিক্রমশিলা

বিক্রমশিলা মগধের তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় পাল বংশীয় রাজা ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধঃপতনের পর পাল বংশীয় নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ বিদ্যায়তন বিক্রমশিলার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

বিক্রমশিলার ভৌগোলিক নির্দ্দেশ—বিক্রমশিলার স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ আছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা সত্য, তাহা অনুমান করা কঠিন। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের মতে সুলতানগঞ্জ নামক স্থানেই বিক্রমশিলা অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক ক্যানিংহামের মতে প্রাচীন নালন্দার তিন মাইল ব্যবধানে এবং রাজগৃহের ছয় মাইল উত্তরে শিলা নামক গ্রামে বিক্রমশিলার স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। স্বর্গীয় নন্দলাল দে বলেন, ইহা পাথরঘাটা নামক একটি পর্ব্বতে অবস্থিত ছিল। এই পর্ব্বত কালগঞ্জ হইতে ছয় মাইল উত্তরে, ভাগলপুর হইতে চব্বিশ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

তারনাথ স্বীয় গ্রন্থে বৌদ্ধ যুগের অনেক সারবান তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তল্লিখিত বিবরণ পাঠে জানা যায়,

পালবংশীয় রাজা গোপালদেব নিজ রাজধানী ওদন্তপুরে এক বৃহৎ বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র ধর্ম্মপাল বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস ও ভিক্ষু-সংঘের বাসোপযোগী এক বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল মগধের প্রসিদ্ধ নৃপতি বলিয়া খ্যাত। মহারাজ দেবপালের রাজত্ব কালে বীরদেব নামে জনৈক বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক যশোধর্ম্মপুরে এক বিহারে স্থায়ীভাবে বাস করিতেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় বজ্রাসন নামে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মহীপাল সারনাথের প্রাচীন বিহারের জীর্ণ-সংস্কার করেন। পালবংশীয় নৃপতি মহীপাল ও ধর্ম্মপালের রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধভিক্ষুগণ তিব্বত প্রদেশে গমন করিয়া তথায় নূতন উদ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু নবম শতাব্দীতে উক্ত প্রদেশে বিরুদ্ধবাদিগণের পরামর্শে তিব্বতাধিপতি তাঁহাদের প্রতি অনেক কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে পালবংশীয় নৃপতি গোপাল সর্ব্বপ্রথমে মগধ রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ওদন্তপুরীর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা গোপালের রাজত্বকালে মগধের বৌদ্ধ সম্প্রদায় সুখে কালযাপন করিতেন। তখনও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয় গৌরব ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই অক্ষুণ্ণ ছিল।

পালবংশীয় অপরাপর রাজগণ বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মগধে ও পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহারা অনেক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকে চারিটি তোরণ ছিল। প্রত্যেক তোরণ বা প্রবেশদ্বারে এক একটি প্রবেশিকা পরীক্ষাগৃহ ছিল। রাজা জয়পালের রাজত্বকালে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছয়টি প্রবেশ দ্বার নির্ম্মিত হয়। ছয় দ্বারে ছয় জন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্ব দ্বারে ছিলেন—অধ্যাপক রত্নাকরশান্তি, পশ্চিম দ্বারে—বারাণসীর অধ্যাপক বাগীশ্বরকীর্ত্তি, উত্তর দ্বারে—অধ্যাপক নরোপ, দক্ষিণ দ্বারে—অধ্যাপক প্রজ্ঞাকরমতি, মধ্যের প্রথম দ্বারে কাশ্মীরের অধ্যাপক রত্নভদ্র এবং মধ্যের দ্বিতীয় দ্বারে গৌড়ের অধ্যাপক জ্ঞানশ্রীমিত্র।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০৮ জন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপকগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—১। রত্নাকরশান্তি, ২। বাগীশ্বর-কীর্ত্তি, ৩। নরোপ, ৪। প্রজ্ঞাকরমতি, ৫। রত্নবজ্র, ৬। জ্ঞান-শ্রীমিত্র, ৭। লীলাবজ্র, ৮। তুর্জ্জয়চন্দ্র, ৯। কৃষ্ণসমরবজ্র, ১০। তথাগতরক্ষিত, ১১। দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান, ১২। মহাবজ্রাসন, ১৩। বোধিভদ্র, ১৪। কমলরক্ষিত, ১৫। কমলকুলিশ, ১৬। নরেন্দ্রশ্রীজ্ঞান, ১৭। দানরক্ষিত, ১৮। অভয়কর গুপ্ত,

১৯। সুনায়কশ্রী, ২০। ধর্ম্মাকরশান্তি, ২১। শাক্যশ্রী, ২২। শ্রীধর, ২৩। লঙ্কাজয়ভদ্র, ২৪। বুদ্ধ-জ্ঞানপাদ, ২৫। ভবভদ্র, ২৬। ভব্যকীর্ত্তি ও ২৭। জেতারী।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ পালবংশীয় মহারাজ ধর্ম্ম-পালের সামসময়িক ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। লঙ্কাজয়ভদ্র লঙ্কা অর্থাৎ সিংহল হইতে আগমন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য শ্রীধর জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবভদ্র পঞ্চাশৎ তন্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। লীলাবজ্রের সময়ে একদল তুরস্ক সৈন্য বিক্রমশিলা অধিকার করিতে আসিয়াছিল। কথিত আছে, ইনি যমারি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উক্ত তুরস্ক সৈন্যদিগকে তাহা অবরোধ করিতে বলেন। তাঁহার মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তুরস্ক সৈন্যগণ নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দুর্জ্জয়চন্দ্র, কৃষ্ণসমরবজ্র, তথাগতরক্ষিত, বিভিন্ন দেশের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। বোধিভদ্র গুহ্যমন্ত্র জানিতেন। অধ্যাপক কমলরক্ষিত প্রজ্ঞাপারমিতা, গুহ্যসময় এবং যমারিতন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার সময় কর্ণ-দেশ হইতে পাঁচ শত সৈন্যসহ তুরস্কের রাজা মগধরাজ্য লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিলেন। তুরস্ক সৈন্যগণ বিক্রমশিলা বৌদ্ধ বিহারের পূজার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে।

তিব্বতীয় লামাগণ বিক্রমশিলায় আগমন করিয়া তত্রত্য পণ্ডিতগণের সাহায্যে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায়

অনুবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, বৌদ্ধাচার্য্য শাক্যশ্রী ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যে সকল ছাত্র প্রবেশার্থী হইয়া আসিতেন, তাঁহারা দ্বারপণ্ডিতগণকে পরীক্ষায় সন্তুষ্ট বা তর্ক শাস্ত্রে পরাজয় করিতে বাধ্য হইতেন। শিক্ষার্থিগণ রাজসরকার হইতে আহার্য্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইতেন।

অপরাপর শিক্ষার্থিগণ গুরুগৃহে বাস করিতেন। যাঁহারা দরিদ্র তাঁহারা কেবল সেবা শুশ্রূষাদ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিতেন। কোন কোন অবস্থাপন্ন শিক্ষার্থিদের নিকট হইতে মাসিক বা এককালীন অর্থ গ্রহণ করা হইত।

তক্ষশিলা, নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষা-পদ্ধতি, পরীক্ষা-গ্রহণ-প্রণালীর বিবরণে জানা যায়, আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিও নানা বিষয়িণী শিক্ষার উপযোগী ছিল। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি, সমাজ-নীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন এবং অন্যান্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল। শিক্ষাপ্রণালী ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শ্রীবুদ্ধজ্ঞানপাদ—পাল বংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধজ্ঞানপাদ বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাচার্য্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভাগীরথীর উপকূলে মহারাজ ধর্ম্মপাল-কর্ত্তৃক দেববিহার বা বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় এক পর্ব্বতের

উপর নির্ম্মিত হয়। এই বিহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। শিক্ষার্থীদিগকে মধ্যবর্ত্তী বিহারে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দেববিহারের শিক্ষার্থীদের জন্য অপর দুইটী ছাত্রাবাস ও একটি অন্নছত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনার কার্য্য চারি শতাব্দী পর্য্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল।

দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান—১০৬৮ খৃঃ অব্দে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান মহারাজ ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাচার্য্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে যে, দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিক্রমশিলার দেববিহারে গমন করেন। উক্ত বিহারে অবস্থানকালে বৌদ্ধ সাহিত্যে গবেষণা করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য সমগ্র বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিল। বিক্রমশিলার বিহারাধ্যক্ষ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে উপনীত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে কৃতকার্য্য হন। তিনি সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নালন্দার এবং পরে মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজত্ব সময়ে বিক্রমশিলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতাধিপতি দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত আহ্বানে তিনি বৃদ্ধাবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ তিব্বতে গমন করেন। তথায় তের বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার করেন।

বখতিয়ার খিলিজির মগধ আক্রমণ ঃ—মগধ সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশের বৌদ্ধ বিহার, সঙ্ঘারাম, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যাবতীয় বৌদ্ধকীর্ত্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তৎকালে উৎপীড়ন ও অত্যাচার ব্যতীত অর্থসংগ্রহ বা রাজত্ব বৃদ্ধির উপায় ছিল না বলিয়া দেশে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়াছিল। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা বৌদ্ধদিগকে অধিক অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের প্রতি এই সকল অত্যাচার সেন বংশের রাজত্বকাল হইতে অধিকতরভাবে চলিয়া আসে। *

দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে দেবপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পৃথীরাজ দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে অজয় নদীর কূলে, কোকিল-কুজিত কুঞ্জকুটীরে জয়দেব কবি সুমধুর উদার স্বরে গাহিয়াছিলেন ঃ—

---

* জগজ্জ্যোতিঃ, ১১শ সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতম্‌,
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশু-ঘাতম্‌
কেশব ধৃত বুদ্ধ-শরীর
জয় জগদীশ হরে। *

ইহা হইতে মনে হয়, বৌদ্ধদিগের প্রতি বিদ্বেষ থাকিলেও বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধ নীতির প্রতি হিন্দুদের বিদ্বেষ ছিল না। পরন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিলে তাঁহারা সকলে প্রণাম করিতেন। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে চিরকাল বিরোধ ছিল। সেনবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধ মঠের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বানুগত বিদ্বেষবশতঃ ক্রমে ক্রমে মঠের ভূমি অধিকার করিতেন। মুসলমানগণের ভারত আক্রমণের পর এই অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া যায়। মূর্ত্তিমাত্রেই মুসলমানের চক্ষে অপ্রিয় ছিল। তাহাতে দেশময় বুদ্ধমূর্ত্তি। অসংখ্য ভিক্ষুগণের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সঙ্ঘারামে বহু ধনরত্ন সঞ্চিত থাকিত। অর্থলোলুপ পাঠানেরা এক একটী সঙ্ঘারাম আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিত। এমন কি, কোন কোন সময় বহু লোককে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিত।

ওদন্তপুরী আক্রমণ ও ধ্বংস ইহার একটী প্রধান দৃষ্টান্ত। বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব্ব বৎসর মহম্মদ খিলিজি বিস্তৃত

* যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীর ও পরিখা পরিবেষ্টিত ওদন্তপুরীর প্রাসাদমালা দেখিয়া উহাকে রাজধানীর কেল্লা কল্পনা করতঃ আক্রমণ করেন। উক্ত প্রাসাদের অধিবাসিগণ দ্বার বন্ধ করিয়া কিছুকাল আত্মরক্ষা করে। মহম্মদ বক্তিয়ার পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে বীরবিক্রমে প্রবেশ করিয়া অল্প সময়ে অসংখ্য লোককে হত্যা ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন।

বিক্রমশিলার অবনতিঃ—মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যায় বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বিজেতা মুসলমানগণ ভারতের সভ্যতার নিদর্শনগুলি এক একটি করিয়া কি ভাবে নষ্ট ও লুণ্ঠিত করিয়াছেন তাহা ভাবিলে মনে বড়ই কষ্ট হয়। পরলোকগত মহামহোপধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় প্রাণের বেদনায় লিখিয়াছেন—"তৎকালে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের গৌরব, বিদ্যার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ বাঙ্গালা দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। বৌদ্ধেরা তিব্বতে গিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও বাঙ্গালায় নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতেছিলেন। এমন সময় ঘোর বন্যার ন্যায় আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বন্যায় রাজা-প্রজা, বৌদ্ধ-হিন্দু, বজ্রযান-সহজযান, ন্যায়-স্মৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান সব ভাঙ্গিয়া, ভাসিয়া গেল। বাঙ্গালী ও বেহার শিল্পের ভাল

ভাল জিনিসগুলি, বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় মন্দির, দেবমূর্ত্তি, মনুষ্যমূর্ত্তি, শাস্তামূর্ত্তি, ভূর্জ্জপত্রের পুঁথি, ভূর্জ্জ-ছালের পুঁথি, নানারূপ কারুকার্য্য, সব নষ্ট হইয়া গেল। ওদন্তপুরে মুসলমানেরা সিপাই বলিয়া হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মারিয়া ফেলিল, কেল্লা বলিয়া মহাবিহারটিকে সমভূমি করিয়া দিল, বুদ্ধমূর্ত্তি ও অন্যান্য সব লুটিয়া লইয়া গেল, সোণা রূপার মূর্ত্তিগুলি গালাইয়া ফেলিল, পুঁথিগুলি পুড়াইয়া ফেলিল। প্রতি বিহারেই এইরূপ হইতে লাগিল। ওদন্ত-পুরের বিহার এখনও চেনা যায়, সে জায়গাটা এখন তিরিশ ফুট উঁচু। নালন্দার নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। পাশের একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের নামে তাহার নাম হইয়াছে "বড় গাঁয়ের ঢিবি"। বিক্রমশিলার * সন্ধান পাওয়া যায় নাই; জগদ্দল খুঁজিয়া মিলিতেছে না; মুসলমানেরা এমন করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে, তাহাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। ভাগ্যে নেপাল ছিল, তিব্বত ছিল, তাই এতদিনের পর তাহাদের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল; ভাগ্যে ইংরাজ রাজা হইয়াছেন, তাই খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া আমরা আমাদের পূর্ব্ব গৌরবের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছি।

* শ্রীযুত নলিনীনাথ সেনগুপ্তের মতে বিক্রমশিলার প্রকৃত নাম—বিক্রমশীলদেব-বিহার।

বিজয়ী মুসলমান নরপতি ও তাহার সৈন্যসামন্ত এবং অনুচরগণ, পৌরাণিক বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তির কোন প্রভেদ করে নাই। তাহারা সকল মূর্ত্তিই হিন্দুর মূর্ত্তি মনে করিয়া বিকলাঙ্গ করিয়া প্রভূত লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া সিন্ধুনদের অপর পারে চলিয়া যাইত। দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে দেশ প্লাবিত করিয়া ক্রমশঃ প্রায় সারা ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। দেবদেবীর অঙ্গচ্ছেদ ও মন্দির ভূমিসাৎ কার্য্য, কি পৌরাণিক; কি জৈন, কি বৌদ্ধ, সকলেই মুসলমান বিজয়ীদিগের সমান ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের নিকট সকলেই হিন্দু ছিল। তখন হিন্দু ও বৌদ্ধের প্রভেদ জ্ঞান ছিল না। তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত ভূমিতে দেদীপ্যমান ছিল। মুসললান সেনাপতি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চতুর্দ্দিকে গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করে। মিনহাজের মতে বক্তিয়ার ঐ সময়ে পাটনার নিকটবর্ত্তী বিহার প্রদেশ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ার গোবিন্দপালের রাজধানী আক্রমণ করে। ওদন্তপুর সঙ্ঘারাম অধিকৃত হইলে, গোবিন্দপালকে নিহত করা হয়। বিজেতার আদেশে ওদন্তপুর ও বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাবিহার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গোলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব্ব উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল তাহারা সকল

দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল, তাহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি হইল, ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি হইল, ক্ষতি হইল ভারতবর্ষের। মুসলমান বিজয়ের পর অনেককেই জোর করিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। যাহারা উক্ত স্থান হইতে গোপনে পলায়ন করিয়াছিল তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল।" *

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ২৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬। বঙ্গে বৌদ্ধবিহার

বাংলায় কিরূপে, কাহার দ্বারা এবং কোন্ যুগে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল উহার ধারাবাহিক বিবরণ আজ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যও অতি অল্প। অধুনা আবিষ্কৃত নাগার্জ্জুনিকোণ্ডলিপিসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতকে বঙ্গে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে চৈনিক পর্য্যটক ফাহিয়ান, সপ্তম শতকের পূর্ব্বার্দ্ধে হিউয়েন-সাং এবং সপ্তম শতকের অপরার্দ্ধে ই-ৎসিং বাংলার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ বিহার বা সঙ্ঘারাম দেখিতে পাইয়াছিলেন। ফাহিয়ান সিংহল যাইবার পথে কিছুদিন তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করিয়া তথায় সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে বহুসংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী স্থবির ও আচার্য্য দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি এই স্থানে বৌদ্ধ সূত্রগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তির ছবি প্রস্তুত করিতে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

পালযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বিহারঃ—পরে হিউয়েন-সাং আসিয়া দেখিতে পান, পুণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রায় বিংশতিসংখ্যক

সঙ্ঘারামে ত্রিসহস্র বৌদ্ধাচার্য্য হীনযান ও মহাযান শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিরত আছেন ; সমতটে ত্রিংশসংখ্যক সঙ্ঘারামে প্রায় দ্বিসহস্র স্থবির বাস করিতেছেন ; তাম্র-লিপ্তিতে দশটি সঙ্ঘারামে প্রায় সহস্রসংখ্যক আচার্য্য আছেন ; কর্ণসুবর্ণে দশ কিংবা ততোধিক সঙ্ঘারামে প্রায় দ্বিসহস্র আচার্য্য সম্মিতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন ; এই কর্ণসুবর্ণের অপর তিন স্থানে দেবদত্তসম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণ অপর তিন সঙ্ঘারামে কঠোর নিয়ম পালন করিয়া বাস করিতেছেন। এ সমস্ত সঙ্ঘারামের মধ্যে হিউয়েন-সাং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বাসিভা এবং কর্ণসুবর্ণের রক্তবিটি বিহারই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ সেনগুপ্তের মতে শেষোক্ত দুইটী সঙ্ঘারাম তৎকালে বিদ্যাপীঠে পরিণত হইয়া থাকিবে। বাসিভা-বিহার বর্ণনা করিতে গিয়া হিউয়েন-সাং বলিয়াছেন, ইহার চত্বরগুলি প্রশস্ত ও আলোকযুক্ত এবং ইহার মণ্ডন ও চূড়া উন্নত, সাত শত মহাযানী আচার্য্য এখানে বাস করেন এবং পূর্ব্বাঞ্চলের বহু খ্যাতনামা বৌদ্ধাচার্য্যগণ এইস্থানে আগমন করেন। রক্তবিটি-বিহার সম্বন্ধে হিউয়েন-সাং বলেন—এই সঙ্ঘারামে কর্ণসুবর্ণের যত খ্যাতনামা, বিদ্বান ও যশস্বী বৌদ্ধাচার্য্য আছেন, সকলে সমবেত হইয়া পরস্পর আলাপ ও আলোচনার দ্বারা আত্মোৎকর্ষ ও সদ্ধর্ম্মের উন্নতিসাধনে তৎপর থাকেন।

ই-ৎসিংয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে তাম্রলিপ্তির 'ভা-রা-হা' নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠের বিবরণ পাওয়া যায়। যেভাবে এই সঙ্ঘারামে স্থবির ও স্থবিরাগণ বিনয়-বিধান মানিয়া সুনিয়ম জীবন যাপন করিতেন, যে ভাবে তাঁহারা সুশৃঙ্খলতার সহিত সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেন, ই-ৎসিং উহার বিশদ্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মপাল নির্ম্মিত বৌদ্ধপীঠ ঃ—শ্রীযুত নলিনী নাথ সেনগুপ্ত তাঁহার "The Buddhist Viharas of Bengal" শীর্ষক সন্দর্ভে আরও সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, পালযুগে বঙ্গে বহু সঙ্ঘারাম প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। তন্মধ্যে বরেন্দ্রাঞ্চলের সোমপুরী এবং বিক্রমপুরের বিক্রমপুরী-বিহার সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য। এই দুই বিদ্যাপীঠ এবং মগধাঞ্চলে বিক্রমশীল-বিহার প্রায় একই সময়ে এবং সদ্ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধর্ম্মপালের সহায়তায় নির্ম্মিত হয়। বিক্রমশীল-বিহার স্থাপন করিয়া ধর্ম্মপাল স্বয়ং বিক্রমশীল-দেব নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় গোপাল-দেবের পঞ্চদশ রাজ্যবর্ষে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র কোনও এক পুথির শেষে "শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেব-বিহার" নামেই বিক্রমশিলা বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে অতীশ 'দীপঙ্করের-রত্নকরণ্ডোদ্ঘাট' নামক মধ্যমক গ্রন্থের পুথির শেষে রাজা দেবপালকেই বিক্রমশীল বিহারের নির্ম্মাতা বলা হইয়াছে।

সোমপুরী-বিহারের স্থান এখনও নির্ণীত হয় নাই। বুদ্ধগয়ার এক বুদ্ধমূর্ত্তির পদস্থানে খোদিত লিপিতে লিখিত আছে যে, সোমপুর-বিহার হইতে সমতটবাসী ও মহাযানযায়ী বীর্য্যেন্দ্রশ্রী মহাবোধি দর্শনে গিয়াছিলেন। পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এক শিলাস্তম্ভের উপর লিখিত আছে যে, এই স্তম্ভ সর্ব্বসত্ত্বের হিতের জন্য শ্রীদশবলগর্ভ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। লিপিদ্বয়ের কোনটীই খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হয় নাই। সম্ভবতঃ পাহাড়পুরই সোমপুরের বর্ত্তমান নাম।

আচার্য্য, মহাপণ্ডিত ও আরণ্যক ভিক্ষু আখ্যায় ভূষিত শ্রীমৎ বোধিভদ্র সোমপুরীর জনৈক খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। এই বিহারে অবস্থান কালেই অতীশ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান ভাব-বিবেকের 'মধ্যমকরত্নপ্রদীপ' গ্রন্থ তিব্বতীতে ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন।

ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুরে বিক্রমপুরী-বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা ধর্ম্মপাল বা বিক্রমের নামেই সম্ভবতঃ বিক্রমপুরের নামকরণ হয়। কুমারচন্দ্র ওরফে আচার্য্য অবধূত যে তন্ত্র-টীকা প্রণয়ন করেন তাহা লীলাবজ্র, কর্ত্তৃক তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়।

ত্রৈকূটক বিহারঃ—ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে বাংলা দেশে ত্রৈকূটক বিহার নামে অপর এক বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ ছিল। এই বিহারে অবস্থান কালেই আচার্য্য হরিভদ্র

'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র সুপ্রসিদ্ধ টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত-বিহার :—চট্টলের পণ্ডিত বিহার এক সময়ে বৌদ্ধ তন্ত্র-শাস্ত্র আলোচনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। ইহার সহিত তন্ত্রাচার্য্য তিলিপা, তিলোপা বা তৈলপাদের স্মৃতি বিজড়িত আছে।

কনকস্তূপ-বিহার :—ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী পট্টিকেরা নগরের সান্নিধ্যে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার ছিল। এই বিহারে মহা-বৈবর্ত্তসংঘভুক্ত আচার্য্যগণ বাস করিতেন। রাজা রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেব খ্রীষ্টীয় ১২২০ অব্দে এই বিহারের উপকারার্থ একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সঙ্ঘারামই কনকস্তূপ-বিহার নামে তিব্বতী 'তাঞ্জুর' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

রামপালনির্ম্মিত জগদ্দল মহাবিহার :—জগদ্দল মহাবিহার মধ্যযুগে বাংলার অন্যতম প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে বিরাজমান ছিল।

এই বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ পালবংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা রামপালদেবের অমরকীর্ত্তি। বিহারের মধ্যে বোধিসত্ত্ব-অবলোকিতেশ্বর ও মহত্তারা মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। রামপালদেবের রাজধানী রামাবতীর কিয়দংশ ব্যাপিয়া এই বিদ্যাপীঠ অবস্থিত ছিল। গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলেই রামাবতী ও জগদ্দল বিহার নির্ম্মিত হয়। বিভূতিচন্দ্র,

দানশীল, তর্কভাষার তিন পরিচ্ছেদের লেখক মোক্ষাকরগুপ্ত, তন্ত্রশাস্ত্র প্রণেতা শুভাকরগুপ্ত প্রভৃতি জগদ্দল বিহারের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। জগদ্দলে অবস্থানকালেই ধর্ম্মাকর আচার্য্য কৃষ্ণপ্রণীত সংবর-ব্যাখ্যা ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন।

এই সকল মনীষিগণের তিব্বতী ভাষায় উল্লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম * নিম্নে দেওয়া হইল :—

বিভূতিচন্দ্র :—ষড়াঙ্গ-যোগ, ষড়াঙ্গ-যোগ-টীকা, শ্রীকাল-চক্রোপদেশ, সূর্য্য-চন্দ্র-সাধন, জ্ঞান-চক্ষু-সাধন, গুণভরণী-নাম-ষড়াঙ্গ-যোগটীপ্পনী, হুহি-পদোভিসময়-বৃত্তি-সংবরোদয়, সংবর-মণ্ডল-বিধি, বজ্র-সত্ত্ব-সাধন-নিবন্ধ, পঞ্চ-ক্রম-মত-টীকা, মঞ্জু-বজ্র-পূজা-বিধি, রক্তারি-চতুহ-শক্তি-প্রখর-সাধন, আর্য্য-সিতা-তাপত্রা-পরাজিতা-সাধন, গুরুসাধন, আর্য্য-মোঘ-পাশ-সাধন, গুরু-সিদ্ধি, অন্তর-মঞ্জরী, স্বপ্নোহন, ত্রিসংবর-প্রজ্ঞা-মাল, বজ্র-চর্চিকা-কর্ম্ম-সাধন, আর্য্যামোঘ-পাশ-সাধন, বোধিচর্য্যাবতার-তাৎপর্য্য-পঞ্জিকা-বিশেষোদ্যোতনী।

শেষোক্ত গ্রন্থ ছয়টি তাঁহারই সংস্কৃত রচনার তিব্বতী-অনুবাদ)।

দানশীল :—মারিচী-সাধন, শুক্ল-চণ্ড-মহারোষন-সাধন, আর্য্যাচল-সাধন, আর্য্য-মঞ্জুশ্রী-সাধন, মনোহর-কল্প-নাম-লোক-নাথ-স্তোত্র, রক্ত-যমারি-মন্ত্র-সংগ্রহ, যমারি-কর্ম্মাবলী-

* শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রণীত Indian Teachers of Buddhist Universities", ১৪৪-১৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাধন-চিন্তামণি, রতিপ্রিয়া-সাধন, যক্ষ-নট-নটী-সাধন, যক্ষিণী-পার্থিবী-লক্ষ্মী-সাধন, যক্ষ-নন্দিকর-সাধন, যক্ষ-রাজ-কীলাকীল-সাধন, পীড়ান-মহাযক্ষ-সেনাপতি-সাধন, শ্রীচন্দ্রদেবী-নাম-সাধন, কুণ্ডল-ধারণী-হারিতী-সাধন, রত্নমালা, নাগী-সাধন, নাগী-বসুপাল-মুখী-নাম-সাধন, নাগ্যা-ফুনামো-পায়, মনোহরী-সাধন, সুভয়া-সাধন, বিশাল-নেত্রী-সাধন, রতিরাগ-সাধন, অপরাজিতা-নাম-সাধন, পূর্ণ-ভদ্রা-সাধন, ভূতি-সুন্দরী-সাধন, শ্রীজয়-সুন্দরী-সাধন, বিমল-সুন্দরী-সাধন, পিশাচ-মণিধর-সাধন, পিশাচ-কিনুপাল-সাধন, কৃষ্ণ-পিশাচ-সাধন, পিশাচ-কৃষ্ণসার-সাধন, পিশাচী-হনা-সাধন, আনুকা-নাম-সাধন, অলগুপ্তা-নাম-সাধন, খরমুখী-সাধন, আহুস্বিণী-পিশাচী-সাধন, উচ্ছুস্ম-নাম-সাধন, ক্ষুক্ষুশ্রী-কুণ্ডলী-সাধন, পিশাচী-গৃহ্যা-সাধন,পিশাচী-কৃষ্ণ-মূর্ত্তি-সাধন,যমারি-চিন্তামণি-মালা-নাম-সাধন, রক্ত-যমারি-সাধন, শুক্লায়িকা-জাত-সাধন, অকজাত-সাধন, আর্য্য-বজ্রতারা-সাধন, অভিসময়-মঞ্জরী, যোগানুসারিনী-নাম-বজ্র-যোগিণী-টীকা, শ্রীমঞ্জু-বজ্রাধিক্রমাতি-সময়-সমুচ্চয়-নিষ্পন্ন-যোগাবলী, হস্ত-বালা-প্রকরণ-কারিকা, কাক-চরিত্র-শিক্ষা-সমুচ্চয়, আর্য্য-বিকনুপ্রবেশাধিকরণী-টীকা, কর্ম্ম-প্রজ্ঞপ্তিসার-সমুচ্চয়-নাম-অভিধর্ম্মাবতার-টীকা।

(শেষোক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয় তিনি জিনমিত্রের সহযোগিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।)

শুভাকর :—তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ

শাক্যশ্রীর গুরু ছিলেন। 'সিদ্ধায়িকা বীর-তন্ত্র' নামক সংস্কৃত গ্রন্থখানি তাঁহারই রচনা।

মোক্ষাকর গুপ্ত :—তিনি অদ্বিতীয় তর্ক-শাস্ত্র পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তর্কভাষা নামক একখানি তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন। পরে এই গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়।

এই চারিজন পণ্ডিত ব্যতীত আরও অনেক পণ্ডিত জগদ্দল বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐতিহাসিক বিবরণ এখন দুর্ল্লভ।

৭। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি *

তৎকালে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকারের পাঠশালা ও বিদ্যালয়সমূহে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। শিক্ষা প্রণালী নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আশ্রম বা তপোবন জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বারাণসীর ন্যায় মহা-নগরীর বহির্দ্দেশে অথবা লোকালয়ের বহুদূরে নির্জ্জন অরণ্য-প্রদেশে স্থাপিত ছিল'। আশ্রমসমূহে বালক-বালিকা উভয়কেই শিক্ষা দেওয়া হইত। অধ্যাপক ও ব্রহ্মচারিগণ পর্ণকুটিরে বাস করিতেন। জনপদবাসী ও শিক্ষার্থীদিগের মাতাপিতা, তাঁহাদের জন্য চাল, লবণ, ঘৃত, নবনীত ও অন্যান্য রন্ধন-সামগ্রী পাঠাইতেন। দেশবাসিগণ উৎসবাদিতেও তাঁহা-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায়স্বরূপ যথোচিত দক্ষিণা প্রদান করিতেন। এই যুগে প্রাইভেট স্কুলেরও অভাব ছিল না। অধ্যাপক স্বয়ং ব্রহ্মচারিগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। অধ্যাপকগণ জনসাধারণের সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। দেশের রাজন্যবর্গের প্রদত্ত

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়ার রেঙ্গুন অভিভাষণ অবলম্বনে লিখিত।

ও ব্রহ্মদানের উপর কতকগুলি স্নাতক শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রহ্মদানের রাজস্ব হইতে এই সকল শিক্ষাগারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। প্রাচীন বিহার অঞ্চলে এই জাতীয় পাঁচ ছয়টি শিক্ষাগার ছিল। উহাদিগকে মহাশালা নামে অভিহিত করা হইত। তথায় স্নাতকগণ শিক্ষা লাভ করিতেন। এতদ্ব্যতীত শ্রমণ ও পরিব্রাজকাদি নানা শ্রেণীর শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল। তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া নানা বিষয় ও নানা শাস্ত্রের বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। তর্কে যাঁহারা পরাজিত হইতেন তাঁহারা বিজেতার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া অপর দলভুক্ত হইতেন। এইরূপ নৈতিক সাহস তখনকার যুগ-ধর্ম্ম ছিল।

বিভিন্ন পরিব্রাজকগণ সাধারণের গমনাগমন-বিহীন শূন্য-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ইহা ব্যতীত অপর এক শ্রেণীর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। উহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। তক্ষশিলা ভারতবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ভারতবর্ষ ও পারস্য সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল ও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনের কেন্দ্র হইয়াছিল। পরবর্ত্তী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। কালক্রমে বৌদ্ধাচার্য্যদিগের হস্তে জাতীয় শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়া পড়ে। নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী, জগদ্দল

এবং শ্রীধনকটক প্রভৃতি পাঁচ ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি চারিটী বিশ্ববিদ্যালয় বিহার অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে শিক্ষার্থিগণ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিতেন।

মনু সংহিতার এক শ্লোকে সদাচার ও মনুষ্যত্ব শিক্ষার জন্য বিশ্ববাসীকে এদেশে আসিতে আহ্বান করা হইয়াছে।

এতদ্দেশে প্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

এই উক্তি সর্ব্বাগ্রে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছিল। বীরজনোচিত আদর্শ সর্ব্বত্রই বিরাজিত ছিল। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন কলেজের চতুর্দ্দিকে চারিটি তোরণ ছিল। প্রত্যেক তোরণ বা প্রবেশ দ্বারে এক একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে বৌদ্ধ যুগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি ও পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালীর অনেক প্রাচীন তথ্য অবগত হওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বিবিধ শিক্ষার উপযোগী ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টাদশ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। অষ্টাদশ বিদ্যা অর্থে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র প্রভৃতি বুঝাইত। কিন্তু ঋক্, সাম ও

যজুর্ব্বেদের প্রাধান্য দ্যোতনার্থ এই তিনটি শাস্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য বারাণসীর বহির্দ্দেশে ও বড় বড় নগরে চতুষ্পাঠী ছিল। তৎকালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে যে কোন শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত হইত না। বারাণসী ও অন্যান্য দেশের রাজপুত্রগণ এবং ব্রাহ্মণবংশধরগণ বাল্যকালে নিজ গৃহে শিক্ষকের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাঁহারা ষোল বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা লাভ করিতে গমন করিতেন। ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তিব্বত, চীন, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে পর্য্যন্ত এদেশের অনুকরণে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরিশেষে পুতুল নাচ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নাটক এবং সামাজিক নাটকের সাহায্যে জনসাধারণকে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা ছিল। ইহাতে তাঁহাদের উদরান্ন সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবৃত্তির বিকাশও সাধিত হইত। বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদিগের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। মনোবৃত্তির পরিপোষক শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা ছিল, রীতিমত উহার অনুশীলন হইত।

শব্দ-সূচী